

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আবু-হুলাতু ওআস্ সালাম 'আলা হাবীবীহী ওআ আলিহী ওআ হুবিহী
ওআ মাও ওআলাহু ফী কুল্লি লামহাতিও ওআ নাফাসিম মিনু কুল্লি যাব্বরতিন 'আদাদা 'ইল্মিল্লাহ

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

(অনুশীলন পর্ব)

নেদায়ে ইসলাম প্রকাশনা

নাজিবি কালীচোত্র

(সং. নাজিবি)

প্রকাশনায় :

নেদায়ে ইসলাম রিসার্চ সেক্টর

আল-উয়েসীয়া, ফরাযীকান্দী কমপ্লেক্স, চাঁদপুর।

খানকাহ-এ-বোরহানীয়া আহমাদীয়া রিফা'য়ীয়া

বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ :

কাজী আসাদুজ্জামান

প্রথম মুদ্রণ - ১৯৭৪ ইং ২৫০০ কপি

পুনঃ মুদ্রণ - ১৯৭৭ ইং ২৫০০ কপি

তৃতীয় সংস্করণ - জানুয়ারী ১৯৮৪ ১০,০০০ কপি

চতুর্থ সংস্করণ - জানুয়ারী ১৯৯৫ ৫,০০০ কপি

পঞ্চম সংস্করণ - ডিসেম্বর ২০০২ ৫,০০০ কপি

মুদ্রণে : সম্পা

হাদীয়া :

পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সূচী

১। ফাতিহা	১
২। ত্বরীকৃত (সংক্ষিপ্ত আলোচনা)	৭
৩। ওআযীফা : (সময় প্রসঙ্গ)	১৭
৪। সাওআব রেসানী	২৩
৫। যিকুর ফিকুর : (লাত্বীফা প্রসঙ্গ)	২৫
৬। এগারো লাত্বীফার যিকুর মুরাক্বাবা	২৬
৭। লাত্বীফা-এ-ক্বাল্ব	২৭
৮। লাত্বীফা-এ-রহ	৩০
৯। লাত্বীফা-এ-সির	৩২
১০। লাত্বীফা-এ-খাফী	৩৪
১১। লাত্বীফা-এ-আখফা	৩৬
১২। লাত্বীফা-এ-নাফস	৩৮
১৩। নাফী-ইস্বাত : ষোণেরা, কোব্বা	৪৪
১৪। লাত্বীফা-এ-আব	৪৮
১৫। লাত্বীফা-এ-আতশ	৫১
১৬। লাত্বীফা-এ-খাক	৫৩
১৭। লাত্বীফা-এ-বাদ	৫৫
১৮। লাত্বীফা-এ-খালা	৫৬
১৯। সুলতানুল আয্কার : ষোণেরা, কোব্বা	৫৮
২০। ফাজর বাদ ওআযীফা	৬১
২১। ইশা বাদ ওআযীফা	৬৩
২২। তাওহীদের ফায়েয	৬৪
২৩। বিশেষ দরুদ শরীফ	৬৮

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

(অনুশীলন পর্ব)

আব্বাস শায়খ মানযুর আহমাদ

আল-আহমাদী উয়েসী নাকশবান্দী

শামিলী চিশতী ক্বাদেরী রিফা'য়ী

বি.এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এলএলবি (ফার্স্ট)

মুমতাজুল মুহাক্কিসীন মুমতাজুল ফুতুহা (ফার্স্ট)

ডিপ (ইউ.এল) এসসিপি (ফার্স্ট ক্লাস)

এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস) পিএইচডি (গবেষক)

আল-উয়েসীয়া (ফরাযীকান্দী) দরবার শরীফের পীর দ্বিব্বলা সাহেবের
কতিপয় আলোচনা, মারিফাতের তালীম

ও

ওআয নাসীহাতের সঞ্চলন।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

(অনুশীলন পর্ব)

এ ঠিক পুস্তক নয়, আলোচনা ও তালীম

তাই এর ভাষাও তদনুরূপ করা

হয়েছে। বাংলা হরফে 'আরবী' শব্দ

লেখার বিষয়ে নতুন রীতি অনুসরণের

চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পুরানো

অভ্যাসের ফলে সব জায়গায়

তা' সম্ভব হয়নি।

ভুল-ত্রুটি অবগত করালে

কৃতজ্ঞ থাকব।

ফাতিহা

সৃষ্টির আদিম উষা থেকে মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে প্রশ্ন প্রথম জন্ম লাভ করে তা হলো আত্মসন্ধান বিষয়ক জিজ্ঞাসা। মানুষের পরিচয়ের সঠিক ব্যাখ্যা লাভের জন্য মানুষ বার বার বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে তার আগমন রহস্যের অমানিশায় তার ঠিকানার বাস্তবতার খুঁজে ফিরেছে। প্রত্যেক মানুষের একটা সামাজিক পরিচয় জন্ম সূত্রেই থাকে- তারপর জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিকাশের সাথে সাথে সে খুঁজে ফেরে তার আত্মার পরিচয়, সৃষ্টির অপার রহস্যমালার আনন্দে অবগাহন করে সে সেই রহস্য ভেদ করার ব্যাকুলতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কিন্তু বিশ্বসংসারের রহস্য ভেদ করার আগে মানুষকে আত্ম উপলব্ধি করতে হয়। তাই ইলাহী জ্ঞান-জগতে প্রবেশের প্রথম সোপান অহম জ্ঞান বা আত্ম সন্ধান। সেজন্যই পৃথিবীর প্রচলিত সব ধর্মেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে আত্মজ্ঞানের- নিজেকে সন্ধান কর, বিশ্ব প্রভুর সন্ধানও তুমি পাবে। আত্ম উপলব্ধি না হলে আত্মার স্রষ্টার উপলব্ধিও অসম্ভব। আমাদের ধর্মের প্রচলিত উপদেশ-

মান 'আরাফা নাফসাহ ফাক্বাদ' 'আরাফা রব্বাহ

যে তার নিজেকে চিনে সে তার প্রতিপালকেও চিনে।

নিজের সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মহান স্রষ্টা

আল্লাহ তা'আলার দিকে-তার পরিচয় কি তা জানার দিকে।

জীবন সংগ্রামে ঘাত-প্রতিঘাতে যখন মুষড়ে পড়ি, চলার পথে পথ হারিয়ে ফেলি, অশান্ত হয়ে উঠি, ভাবনার খেঁচি হারিয়ে ফেলি, অসহায় হয়ে মনের বেদনায় আত্মনাদ করি, থাকেনা যখন আপন সত্ত্বা শক্তি, এ বিশাল পৃথিবীতে যখন কোথাও এতটুকু আশ্রয় দেবার কেউ থাকে না, এতো কোলাহলের মাঝেও পৃথিবীটা যখন গুন্ধ্য মনে হয়, যন্ত্রণার সাগরে যখন ডুবতে থাকি, নিরাশার রাহু যখন গ্রাস করতে থাকে, এতো কাতরতা যখন কারো প্রাণে নাড়া দেয় না, এতো ভরসা যখন

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

ধূলিসা্যত হয়ে যায়, আপন বলতে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, জীবনের প্রতি যখন আস্থা হারিয়ে ফেলি এমন কি আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসি, তখন যিনি আশার আলো জ্বেলে হাতছানী দিয়ে ভরসা দেন, সহায় বল হয়ে পাশে দাঁড়ান, আপন সত্ত্বায় আপন হয়ে ধরা দেন, রাহমুক করে আমার যন্ত্রণার কাতরাগিতে যিনি প্রেমের পরশে মায়ামারা বুকে স্থান দিয়ে শান্তনা দেন, আর নিজের অজান্তেই তখন যার কাছে নিজেকে সঁপে দেই, তিনিই পরম শ্রিয়, পরম আপন, তিনিই স্রষ্টা বিধাতা, তিনিই প্রেমময়, আমার প্রাণের আল্লাহ।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগত কত বিশাল তা কে জানে? সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় মানব জগৎ বা এ পৃথিবীটা একটা রাই বা সরিয়া ভুল্য। যদি মানব জগতের মত সমস্ত জগতগুলো দেখা যেতো, অথবা যদি কিছুটা অনুধাবন করা যেতো, তাহলে হয়ত কিঞ্চিৎ মহত্বের পরশে, আবেগে উল্লাসে, ব্যাকুল মন চিৎকার করে বলে উঠত আল্লাহ আক্বার-আল্লাহ মহান, ওগো প্রভু আমার তুমি যে কত মহান। অপার সৃষ্টির মাঝে আমাকে কেন মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করলে? মৃত্তিকার স্থূল শরীরে কেন এত বিচিত্র রূপ, কেন সুখ দুঃখ, কেন হাসি কান্না, কেন মায়ামতা, ভালবাসা, কেন বিরহ জ্বালা? এ অনুভূতি কেন? হৃদয়ের বেদনা, আত্মার অশান্তি- দেহ মনের উপর এর এত প্রভাব কেন? আত্মাই কি স্রষ্টার সৃষ্টির যোগসূত্র, স্থূল সুক্ষ সব ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই কি আত্মার অনুভূতি? সৃষ্টির মাধ্যমেই অনুভূত হয় সুক্ষ, তাই আত্মার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায় আল্লাহকে।

আমি মানুষ, আমার সাথে আল্লাহর এ যোগসূত্র কেন? কিসের সম্পর্ক? অনুভূতি দ্বারা কি বুঝতে হবে আমাকে? তাহলে তিনি কি আমাকে ভালোবাসেন? আমি যদি তার ভালবাসা না বুঝি, তা হলে এ অনুভূতি যে অর্থহীন।

আমার আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন, তাই আমি না চাইতেই অন্য কোন সৃষ্টির শ্রেনীভুক্ত না করে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে আমাকে মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, আর সব সৃষ্টি আমারই জন্য। আর তিনি বলেছেন- "আমি গুণধন ছিলাম, ভালবাসার আতিশয্যে নিজেকে গোপন করে রাখতে না পেরে আমার পরিচয় দেয়াটাই পছন্দ করলাম, আর ভালবাসা অনুধাবনে সক্ষম করে সৃজন করলাম 'মানব' আর তার সাথে সৃষ্টির সব কিছু।" একমাত্র আল্লাহই মানুষের স্রষ্টা,

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

প্রতিপালক, উদ্দেশ্য-পাথের দিশারী, পাথের, সহায় সম্বল, বাসনা-সাধনা, ভালবাসার ধন। তাঁর গ্রিয় সৃজন মানুষকে চেনাতে, জানাতে বুঝাতে- তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি পাঠালেন যুগে যুগে কত দূত নাবী-রাসূল। তিনি মহাম-হিম, সর্বজ্ঞ, শক্তির মালিক, ক্ষমার মালিক, দয়ার মালিক এবং প্রেমের মালিকও। তাঁর পরিচয় পেলেই, তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই জীবন স্বার্থক। পরিচয়েই ঘটে সন্নিধ্য। কাছাকাছি হলেই সৃষ্টি হয় প্রেম প্রীতির বন্ধন, আর স্থাপিত হয় নিখুঁত ভালবাসা। ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসা। সেখানে বিরাজ করে শুধু ভাল-বাসাবাসি, গড়ে উঠে একান্ত নিবিড় পরিবেশ।

আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার মাহাত্ম বুঝতে পেরেছিল জ্ঞানী ইবলিস আযাযীল তাই প্রেমের দ্বিতীয় পক্ষ মানুষকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্তে মর্মাহত হয়ে হিংসার জ্বলে উঠেছিল সে, আর সংকল্প নিয়েছিল মানুষকে স্রষ্টার ভালবাসার পাত্র না হতে দেয়ার।

সৃজনে, প্রতিপালনে, ক্ষমা-ক্ষমতায়, নিয়মে নিয়ন্ত্রণে, ভাবনা ভালবাসায়, তিনি একক। ধ্যান ধারণায় তাঁরই স্থান- এরই নাম তাওহীদ। বস্তুতঃ এই তাওহীদই ইসলামের প্রধান ভিত্তি এবং মূলমন্ত্র। এর কোন পরিবর্তন নেই- এটা সর্ব যুগে নির্বিকার নিত্য এবং স্থির। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি বৈচিত্র্য, সব অনুভূতি, সকল কিছুই আপাততঃ বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যেমন সব কিছুতেই একত্ব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি যার অপার করুণায় চন্দ্র-সূর্য জ্যোতিঃ বিকিরণ করে, ফুল সুরভিত হয়ে ফুটে, পাখী কুজনে মুখর হয়, তিনি একক এবং অবিভাজ্য। শব্দার্থগত ভাবে তাওহীদের অর্থ একত্ববাদ। বিশ্ব পরিচালক প্রভু এক, একক কারো নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রভাব তাঁর উপর নেই। তাঁর সৃষ্টি কৌশলেও নেই কোন অংশীদার।

মহান আল্লাহ তা'আলা আদি-অন্তে ও গোপন-প্রকাশ্যে চির বিরাজমান। বিশ্বজগতের যাবতীয় দৃশ্যমান ও আদৃশ্য বস্তুর তিনিই উৎস। তাঁর করুণায় পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সমাধা হয়ে থাকে। সত্যের সঠিক, যথার্থ ও সমাক উপলব্ধি ও বিশ্বাস তাঁরই দান, তাঁরই ভালবাসার অপার আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তাঁর ভজন, ইবাদাত বা গোলামী তাওহীদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মুন্সীরের পছন্দই গোলামের পছন্দ, তাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা, তাঁর খুশীতে খুশী এবং নারায়ী বা অসন্তুষ্টিতে

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

অসন্তোষ। মুনীব আল্লাহ যে আমার মাহবুব, ভালবাসার ধন। সৃষ্ট মানব, স্রষ্টার ইচ্ছাকেই আপন করে নেবে এটাই কাম্য। আল্লাহও তাদের এমনি আপন করে নেন যে, বিনা দ্বিধায় তাদের সম্মুখে জানিয়ে দিতে চান যে তারা আপন সত্ত্বা এমন কি তাদের ইরাদা বা ইচ্ছা করাটাও আমার উপর ন্যস্ত করে দেয়। “ওআমা তাশাউনা ইল্লা আয়্যাশা আল্লাহ” তাহারা কোন ইচ্ছা পোষণ করে না, তবে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন- এক কথায় আমি আল্লাহর ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। এর ব্যতিক্রমও কেবল মাত্র সৃষ্টি মানুষ করুক এটা আল্লাহ সহিতে পারেন না। আর এ ব্যতিক্রমও কেবল মাত্র সঠিক পরিচয়ের অভাবেই হয়ে থাকে। তাই শুরু হল শায়ত্বানের সংগ্রাম, যাতে মানুষ তাঁর সঠিক পরিচয় না পায় এবং অজ্ঞতার বশে তাঁর স্থলে দাড় করিয়ে দেয় মানুষ, ক্ষমতার অসংখ্য অধিকারীকে।

সৃষ্টি হবার পর জীবন পথে চলতে চলতে মানুষ বার বার দুর্বল হয়ে পড়েছে শায়ত্বানের প্ররোচনায়। পৃথিবীর আলো, বাতাস, হাসি, কান্না, মায়া-মমতা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে শায়ত্বান মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে সে বার বার অন্ধকারে পথ হারিয়ে মরেছে। মানুষের এ দুর্বল মুহুর্তে তাদের মুখ্যতা তাঁদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের ধারণাকে বিচূর্ণিত করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টি উপাদানকে স্রষ্টার বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী ধারণা করে, ‘মনগড়া প্রভু’ বানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। এমনি করেই অদৃশ্য, কিন্তু অনুভবযোগ্য বায়ু প্রবাহে মানুষ বিস্মিত হয়ে- বাতাসকে দেবতা এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পুরুষকে দেবতা হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। তেমনি বিত্তীর্ণ সমুদ্রের জলরাশি দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে, আগুনের দহনকারী লেলিহান শিখা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দেব দেবীর অস্তিত্ব। প্রাচীন ভারতে দেখতে পাই পবন দেবতা, মনসা দেবী, পারশ্যে দেখা যায় অগ্নি উপাসনা আর মরুভূমি অঞ্চলে ছিল বিশাল ধূসর মরুভূমির অধীশ্বর কালনিক স্ত্রিংকসের উপস্থিতি।

এরই মধ্যে শায়ত্বান মানবদেহে ষড়রিপুর তোরণ দিয়ে প্রবেশ করেছে। তারই প্রভাবে সমাজের খল এবং কুটিল প্রকৃতির লোকেরা বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্যের ঘটনা সৃষ্টি করে মানুষের আস্থা ভাজন হলো, ক্রমে ক্রমে প্রভাবশালী হলো। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়ণ করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এর ফলেই জন্ম

৪

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

তা'আলার পরিচয় ও বিশ্বাস। তাই নাবীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মোনাই হলো শায়ত্বানের প্রধান কাজ। অবশ্য সে এর চেয়েও বেশী কৃতকার্য হয়েছিল নাবীগণকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে হত্যা করে। তাঁরা এসেছিলেন সঠিক পথ দেখাতে, পথ চলতে যাতে মানুষকে পথ হারা না হতে হয়, বিশ্বাসে যাতে আবিলতা না থাকে, ভালবাসা যাতে নিঃস্বার্থ ও নিখুঁত হয়, সম্পর্কে যেন ঘৃণা না ধরে।

প্রিয়জনের অনুকরণ করা ও তাঁর পছন্দ মত চলাই ভালবাসার ধর্ম। নিজ খেয়াল খুশী মত চলা উচ্ছৃংখরতারই পরিচায়ক। এক নাবীর অবর্তমানে আল্লাহকে ভুলে মানুষ যখন বিপথগামী হয় তখনই পাঠাতেন অপর নাবী বা রাসুল। তাঁরা আল্লাহর বান্দাদেরকে বলতেন- তোমরা বিপথগামী হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে, আবার ফিরে এসো, দেখবে তোমরা সহায়হীন নও। তোমরা বল “আমার মহব্বতের আল্লাহ আমার সহায় সাথী। তিনি আমাকে এফুনি বিপদ থেকে রক্ষা করবেন- পথ দেখাবেন। বিপদ জীবনের সব ক্রটি ক্ষমা করে দেবেন। ক্ষমাই তাঁর মাহাত্ম্য। আমার প্রভু মহৎ মহান, ক্ষমাশীল, দয়ালু।” এমনি করেই অসহায় মানুষ খুঁজে পেতো প্রেমময় আল্লাহকে।

প্রত্যেক নাবীর আবির্ভাবের পূর্বের সময়টাকে ‘আইয়্যামে জাহেলীয়াহ’ বা অজ্ঞতার যুগ বলা হত। তখনকার লোকেরা জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী ছিলেন বটে, কিন্তু যে জ্ঞান স্রষ্টার পরিচয় দেয় না তা মুখ্যতারই শামিল। নানারূপ কুসংস্কারে ভরে যেত তাদের ধর্মবিশ্বাস। তারা আলোর পথ থেকে সরে যেতো দূরে, আরো দূরে। এমনি অন্ধকার যুগে আবির্ভাব হয় নাবীগণের মূল এবং শেষ নাবী আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা স্ফাল্লাহ ‘আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লামার। তাঁর পরে কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন নাবী বা রাসুল আসবেন না। তাঁর তিরোধানের পর কিয়ামাত পর্যন্ত তেমন দুর্যোগময় অবস্থায় পুনরাবৃত্তি ঘটবে যুগে যুগে। সেজন্যই শতাব্দী পর পর ও সহস্র বছর পর পর এক এক জন যুগান্তকারী সংস্কারকের আবির্ভাবের আভাস দিয়েছেন আখেরী নাবী আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা স্ফাল্লাহ ‘আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লাম। তাই সম্রাট আকবরের ‘দীনে-এলাহী’ ধর্মের মূল্যোৎপাটন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বিতীয় সহস্র বছরের সংস্কারক, হায়রাত শায়খ আহমাদ সারহিন্দী ফারুকী রাহিআল্লাহু আনহু'র।

৬

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

নেয় আর্থভারতে পৌরোহিত্য প্রথা। সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই ছিল সমগ্র রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তেমনি মিশরের রাজা ফারাওরা (ফেরউন) ঈশ্বর জ্ঞানে পুজিত হত। পবিত্র কুর'আনে ‘শাদাদ বাদশাহ’র ঘটনাও এর আর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মানুষ যুক্তি দিয়েই সব কিছু বুঝতে চায়, এক ঘটনার সূত্র ধরে উপনীত হতে চায় আরেক বিষয়ের সমাধানে। সীমিত জ্ঞানের সীমারেখার মধ্যেই তাকে ঝুঁজতে হয় যুক্তির উপকরণ, আর এর প্রয়োগ সবদিক থেকেই যে সঠিক, তা দাবী করাও কঠিন। কারণ, ফল যা দাঁড়ায় তা অনেক সময়ে দেখা যায়, যা দাঁড়াবার তার ব্যাক্রিক্রম। ফলে মানুষকে একবার প্রকল্প (Hypothesis) করে সেটা সমস্যা সমাধানে অপারগ হলে আবার নতুন প্রকল্প করতে হয়। যিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ, আর দান করলেন যুক্তি বুঝার জ্ঞান ও বোধশক্তি; তিনিইহত জানিয়ে দিয়েছেন :

ওআ মা উতীতুম মিনাল ইলমি ইল্লা ক্বালীলা

জ্ঞানের ভাগুর থেকে যা তোমাদের সকলকে দান করেছে তা অতি সামান্যই।

যা আমি দেখি, তার সবটাই আমি বুঝি না। তা'ছাড়া এমনতো বহু কিছুই আছে যা আমি দেখি না জানি না। আল্লাহর সৃষ্টি যা মানুষের জ্ঞানে সূক্ষ্ম, তার সব কিছুই অনুধাবন করা যায় না। কিছু দেখা যায়, কিছু বুঝা যায়, কিছু অনুভব করা যায়, কিন্তু এরই মধ্যে সবকটা বুঝানো যায় না। যেমন, ঘরে বসে আছেন, দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে দরজা বন্ধ করে দেন, বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে। গাড়ী চলছে, বাতাস অসহ্য- কাঁচ উঠিয়ে দেন, বাতাস বাঁধা পেল, কিন্তু রোদের তাপ ঠিকই লাগছে-আটকানো গেলানো, কারণ এটা বাতাসের চেয়ে সূক্ষ্ম। বাতাস দেখা যায় না, শুধু ঠাণ্ডা বা গরম আমেজে অনুভব করা যায়। প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম জিনিসের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আলাদা ও সূক্ষ্ম। আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দ্বারাই মানুষ প্রমাণ করেছে সূক্ষ্মতমই, (যেমন- এটম, অণুপরমাণু) অধিক শক্তির অধিকারী।

আল্লাহর দূত আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিকার, সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহর সঠিক পরিচয় দেয়ার জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন। প্রথমতঃ নাবী রাসুলকে বিশ্বাস করার উপর নির্ভর করে আল্লাহ

৫

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

ত্বরীক্বত

(সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

প্রাণী হিসাবে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ নিঃশ্বাস, আর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে মানুষের অমূল্য ধন ‘ঈমান’। ঈমানকে কলুষিত করার ভেতর রয়েছে শায়ত্বানের সার্বকতা। ঈমানের সবলতা ‘আক্বীদার’ বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। শারী'আতের দু'টি দিক- ‘আক্বীদা (Conviction-বিশ্বাস) ও ‘আমল (Action-কাজ)। ‘আক্বীদার মধ্যে সূক্ষ্মতম ক্রটি থাকলেও কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, আর সে অবস্থায় যতই আমল করুক, কাজে আসবে না। মানুষ যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের সম্বিলিত প্রাণী-উভয় উপাদানই পৃথক পৃথক ভাবে ক্রিয়াশীল। তাই দেহের সাথে আমলের (কর্মের) সংযোগ আর ঈমানের সাথে ‘আক্বীদার (বিশ্বাসের) সম্পর্ক।

‘আরবী ভাষায় আক্বীদা শব্দের ভূতপতি ‘আক্বদ’ থেকে-অর্থ বন্ধন। কোন কিছুতে গিট বা গিড়া গ্রহিৎ লাগানোর অর্থে ও ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিস খুলে যাবে না এ বিষয় নিশ্চিত করতে যেমন গিড়ার প্রয়োজন, তেমনি ভাবে দুটি অস্তিত্বকে পরস্পর সম্পৃক্ত করে অজানা অচেনাকে আপন করে, এক করে দেবার মধ্যেই রয়েছে বন্ধনের স্বার্থকতা। তাই দুটি নারী ও পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রকে বলা হয় ‘বিবাহ বন্ধন’। আবার একটি সত্ত্বার প্রতিটি গুণাবলী বা আচার আচরণকে উপলব্ধি করে, প্রত্যক্ষ করে যে পরিচিতি লাভ হয়, তার প্রত্যেকটি এক ও অভিন্ন। কারন সব মেনে নিলে ও একটিকে অস্বীকার করার কারণে পুরো বিষয়টাকে অস্বীকার করা হয়। তাই যেমনি এককভাবে তেমনি সার্বিকভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা বিশ্বাস করার নামই ঈমান। এ বন্ধনে পর আপন হয়ে যায়, দুই এক হয়ে যায়, ভিন্ন অভিন্ন হয়ে যায় তাই ফারসী কবির হুসেদ উচ্চারণে হলো-

মান তু শুদাম

তু মান শুদী

৭

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

মান তান শুদাম
তু জাঁ শুদী
তা কাস না ওইয়াদ
বা'দ আযী
কে মান দীগারাম
তু দীগারী।

অর্থ- আমি তুমি হয়ে যাব, তুমি আমি হয়ে যাবে, আমি দেহ হয়ে যাব, তুমি প্রাণ হয়ে যাবে, এরপর কেহ যেন বলতে না পারে যে, আমি ভিন্ন, তুমি-ভিন্ন। সর্বোপরি শায়তান সময় সময় সুফা ও নিপুন ভাবে বিশ্বাসে খুঁত সৃষ্টি করে, যা শায়তান থেকে বাঁচার কলাকৌশল না জানলে বুঝা সম্ভব নয়। সেই কলাকৌশল, সে বিশেষ প্রক্রিয়াই ত্বরীকৃত। 'আক্বীদাকে' বিশুদ্ধ ও আমলকে সৃষ্টি করতে ত্বরীকৃতের প্রয়োজন। এক কথায় যে বিদ্যা অর্জন করলে শারী'আতকে নিখুঁতভাবে পালন করা যায় তারই নাম ত্বরীকৃত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ইন্না জা'আলনা লাকুম শির'আতা ওআ মিনহাজা

“আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সাধারণ পথ শারী'আত ও একটি বিশেষ পথ মিনহাজ সৃষ্টি করেছি।”

এই বিশেষ পথই যে ত্বরীকৃতের পথ সে বিষয়ে কারো সন্দেহ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু প্রকৃত পরিচিতির মাধ্যমে সত্যক অবগতি লাভ করা যায়, তাই 'ইলমে মারিফাত বা পরিচয় বিজ্ঞান 'ইলমে ত্বরীকৃতের বিশেষ দিক। যে পরিচিতির কথা সৃষ্টি রহস্যের মূল, যে পরিচয় দেয়ার জন্য এক বা দু'লাখ নাবী রাসুলের আগমন, সেই পরিচয় সান্নিধ্য, সেই ভালবাসার কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথকে নিষ্কণ্টক, সহজ, সরল করার জন্যই শত শত মকুবুল ত্বরীকৃতের আবিষ্কার। শারী'আত বাদ দিলে ত্বরীকৃত থাকে না। যারা শারী'আতের অনুশাসনকে প্রয়োজনীয় মনে করে না- তাদের পথকেও ত্বরীকৃত বলতে গেলে, শায়তানের ত্বরীকৃত বলতে হয়। এক কথায় যা শারী'আতকে নিখুঁত করার স্থলে কলুষিত করে তা ত্বরীকৃত নয়।

৮

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

সুন্দর হয়ে উঠবে যখন একদিকে মানুষ তার বিচার বিবেককে জাহাজ রাখবে আর অপর দিকে ত্বরীকৃত লব্ধ সুন্দর গুণাবলীর সমন্বয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে পরম পবিত্র স্রষ্টার কাছে পরিজ্ঞান পাবে, নিজেকে প্রেমের আগুনে জ্বালিয়ে অস্তিত্বকে হারিয়ে তারই মাঝে বিলীন হতে পারবে। চির নির্বান লাভ করবে, পাবে তার প্রেমময় সান্নিধ্য।

“ইন্নালাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওআল ইহুসান”

অর্থ- আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন-বিচার বিবেক খাটাতে এবং কল্যাণ করতে।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা আরো নির্দেশ দিচ্ছেন-

উদ'উ ইলা সাবিলি রাক্বিকা বিল্ হিক্মাতে ওআল মাওইযাতিল হাসানাতি

তোমার প্রভুর পথে (তোমার আল্লাহর বান্দাদেরকে) কৌশলে (হিক্মাতের সাথে) এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা ডাক।” এখানে হিক্মাত বলতে মারিফাত বা ত্বরীকৃতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রকৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও যে তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ত্বরীকৃত অস্বীকারকারীগণ কতনা প্রাণহীন এবং প্রাণহীন জগতে বাস করছে।

প্রথমতঃ ত্বরীকৃতের ধারণা যখন আরব দেশে প্রচলিত হয়, তখন পৌণ্ডলিক ভারতবর্ষের সাথে কোন যোগাযোগ আরবীদের ছিল না। সুতরাং হিন্দু পৌণ্ডলিকতা থেকে এর 'ধার করে আনা' প্রচারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ত্বরীকৃত সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনেই যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। খোলা ফায়ে রাশিদীন, আশ্বাহবে সোফফা অন্যান্য সাহাবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওআসাল্লামার নিকট থেকে ত্বরীকৃতের বা মারিফাতের দীক্ষা পেতেন।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত আধুনিক কাঠামোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্বরীকৃত বিষয়ক প্রভূত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শারী'আত ও ত্বরীকৃত সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ ও বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য পূর্বাপর ঘটনা চিন্তা করলে এই বিতর্কের সূত্রপাত সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা ও জড়বাদের ভাবধারায় প্রভাববশিত প্রচারনার ফলে আজ তাওহীদ, ইসলাম, কুর'আন, হাদীস ও ত্বরীকৃত সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। কাহারো ধারণা এই যে, যেখানে শারী'আত আমাদের ধর্মে প্রচলিত, সেখানে ত্বরীকৃতের যে আবশ্যিকতা নেই শুধু তাই নয়, তাঁদের ধারণা, ত্বরীকৃতের কথা হাদীস, কুর'আনে পাওয়া যায় না। তাঁদের মতে এটা ভারতের হিন্দু পৌণ্ডলিকতা খ্রীষ্টানদের যীশুমূর্তি উপাসনা থেকে ইসলামে সংক্রমিত হয়েছে। কেউ কেউ ধারণা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওআ সাল্লামার বেখাল মুবারাকের পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ গ্রীক, খ্রীষ্টান এবং পারসিক জোরায়ান্তার ধর্মাবলম্বী দার্শনিকদের সংস্রবে আসেন এবং সেই সব ধর্মের আধ্যাত্মিক ধারণা ইসলামে আনয়ন করে ত্বরীকৃত নামে নব বিধানের সৃষ্টি করেছেন।

যে কোন নতুনত্ব এবং পরিবর্তন, মঙ্গলকামী হলেও সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, গোড়ামি এবং অবিশ্বাস দ্বারা যুগে যুগে লালিত হয়েছে। মানুষ তার জ্ঞানের জগতকে যে প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর করে তোলার নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত, তা এবং তার ফলাফল প্রথম দৃষ্টিতে কোন কালেই কোন মানুষ শ্রদ্ধার চোখে

কুর'আন হাদীস শিক্ষা করে বিদ্যান বা 'আলিম হওয়া যায় মুস্তাকী বা পরহেযগার হওয়া যায় না, তেমনিভাবে শুধু শারী'আত নিয়ে থাকলে মুম্বীন হওয়া যায় না।

জীবনকে সুন্দর করতে শারী'আত-ত্বরীকৃত উভয়ের প্রয়োজন। বাহ্যত সব বিষয়গুলো প্রকাশ্য অনুশাসনের আওতাভুক্ত। তাই সেখানে স্রাস্টার প্রতি ও সৃষ্টির প্রতি উভয় দায়িত্ব-অপর কথায় ব্যক্তিগত ও সমাজগত দায়িত্ব পালন করার মাঝেই রয়েছে সৌন্দর্যের বিকাশ। এ জীবন, এ সমাজ তখনই

৯

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

মূল বিতর্কের সূত্রপাত হয় প্রকৃতপক্ষে ইয়াযীদের আমল থেকে। তৎকালের ত্বরীকৃত অবলম্বী সম্প্রদায় ইমামের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ইয়াযীদের বায়আত অস্বীকার করার ফলেই ইয়াযীদ পন্থীরা ত্বরীকৃত পন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে, ত্বরীকৃত একটি নব দার্শনিক বিধান বলে প্রচার করতে শুরু করে। বিদ্রোহী মতভেদের মূল, নচেৎ শারী'আত ও ত্বরীকৃত উভয়ের বিধানই এক, সত্য ও প্রকৃত এবং সকল মুসলমানদের অবশ্য পালনীয়।

ধর্ম বলতে একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। সমস্ত আসমানী কিতাব বা স্বহীফাহতে ইসলামের বিধান প্রণালী আছে, তবে একত্রে একই সময়ে তা মানুষের কাছে আসেনি। যখন যে সময়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র সংগঠনে যে সব বিষয় পর্যালোচনা করা দরকার সে সব বিষয়বস্তুর সময়সূচ্যই সে সময়কার কিতাব বা বিধানলিপি নাবী বা রাসুলগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ত্বরীকৃতের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিও ঠিক তেমনি ভাবে একই ধারায় চলে আসছে।

হাযরাত মুজাদ্দিদ আল ফেসানী (রাঃ) এর আগমনের পূর্বে ইসলামের রূপান্তরের চেষ্টা করা হয় 'দীনে এলাহী' দিয়ে। তেমনি তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদের উপর এসে পরে বিরাট ঝুঁকি ওয়াহদাতুল ওআজ্জদের। মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রাঃ) এর আগমন হয়েছিল দীনে এলাহিকে রদ করে ইসলামকে নিখুঁত রাখবার জন্য। তিনি আরও ওআহদাতুল ওআজ্জ সর্বস্বরবাদ বা সিল্‌সিলায়ে হামাউন্ত অর্থাৎ সবই তিনি এ ধরণের ধারণাকে শিরক বা বাতিল ঘোষণা করে রূহানী তাওআজ্জ দ্বারা ওআহদাতুল শ'হদ- অর্থাৎ সৃষ্টি জগতে যা কিছু দেখা যায় সব কিছুই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য সুরূপ বিরাজ করছে, (বা সিল্‌সিলায়ে হামাউন্ত অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহ থেকে - এক কথায় আল্লাহর সৃষ্টি, এই সঠিক আক্বীদা স্থাপন করে গেলেন। আর এ 'আক্বীদাকে শিরক মুক্ত করাই হলো মুজাদ্দিদীয়া ত্বরীকৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তেমনি ভাবে প্রত্যেকটি ত্বরীকৃত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ত্বরীকৃতকে আহমাদীয়ার কথায় ধরা যাক। যদিও আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, কারণ

আল্লাহর প্রিয় হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লিম, যিনি সৃজনে প্রথম আর আগমণে নাবীগণের শেষ, যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না, যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী জানেন, চিনেন সর্বাধিক জানেন, সঠিক পরিচয়ে প্রেমময় আল্লাহকে মাহুব করে, সে প্রিয়ের প্রশংসা করে যিনি নাম' পেলেন আহমাদ (সর্বোত্তম প্রশংসাকারী), যিনি সে পরিচয়ের পরিণয়ের, ভালবাসার উপলব্ধি ও অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করে সাথে সাথে হলেন মুহাম্মাদ (সর্বোত্তম প্রশংসিত), তখন থেকে যাঁর নাম হলো মুহাম্মাদ মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম, তাঁর সর্বপ্রথম নাম 'আহমাদ' অনুসারে যে ত্বরীক্বা, তার তাৎপর্য আমার মত নালায়েক কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে।

বহু ত্বরীক্বার মধ্যে আমরা যে দু'শত পঞ্চাশটির মত ত্বরীক্বার নাম পাই তার মধ্যে অনেক ত্বরীক্বার সনদ সরাসরি রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম থেকে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ত্বরীক্বাই 'মুহাম্মাদীয়া ত্বরীক্বা' নামে পরিচিত, নাম করণ করেছেন সে সব ত্বরীক্বতের ইমামগণ, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার 'মুহাম্মাদ' নামানুসারে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবর্তকের নাম উম্মাত মুহাম্মাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। ত্বরীক্বা সমূহের মধ্যে একাধিক ত্বরীক্বার নাম ও আছে আহমাদীয়া। কিন্তু সবগুলো ত্বরীক্বারই নাম করণ হয়েছে ত্বরীক্বার প্রবর্তক বা ইমামের নামে।

ইমামুত ত্বরীক্বাত হযরাত শায়খ সাযিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রাঃ) যে ত্বরীক্বা বিশ্বের মুসলমানদের সামনে তুলে ধরলেন, সে ত্বরীক্বা তাঁর নিজের খেয়াল খুশীমত বা নিজের নামানুসারে হয়নি। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার তা'লীম ও রহানী নির্দেশ মতই জারী করা হয়েছে, এমনকি নামকরণও প্রথম নাম 'আহমাদ' অনুসারে করা হয় 'ত্বরীক্বায়ে আহমাদীয়া'।

ত্বরীক্বার প্রতিটি সবকের হাকীক্বত বা রহস্য তো রয়েছেই, শুধু আহমাদ নামে নামকরণের হাকীক্বত যে কি, তা শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর হাবিব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামই ভালো জানেন, তবে আমার

১২

'আহমাদ' স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম। বলা বাহুল্য যে, কোন ব্যক্তির সঠিক পরিচয় দিতে তার আসল নামই বলা হয়।

যুগ যুগ ধরে ভাবকের মন বলে আসছে :
আহমাদেরই মীমেরই পর্দা উঠিয়ে দেখনা মন।
আহাদ সেথা বিরাজ করে জান মুমিনগণ।

দুই বন্ধুতে তাফাৎ এতটুকু যে আহাদ স্রষ্টা, আহমাদ সৃষ্ট। মীম দ্বারা সৃষ্ট বা মাখলুকের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সৃষ্টি রহস্যের মূলে যে মুহাব্বাত, সৃষ্টি হিসাবে প্রথম বিন্দু যাঁর নাম নূরে আহমাদী বা নূরে মুহাম্মাদী, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাই প্রথমতঃ ভালবাসার ভিত্তি। তার উপর ভালবাসার একটা প্রতীক, যার দু'টি নাম বিকাশ সূত্র বা বাহন। এ দু'টি নামের ভেদ রহস্য যেমন আলাদা, তেমনি তাৎপর্যও পৃথক। ত্বরীক্বতে উভয় হাকীক্বত আলাদাভাবে উপলব্ধি করার জন্য হাকীক্বতে আহমাদী ও হাকীক্বত মুহাম্মাদী দু'টি আলাদা সবক রয়েছে। এ হাকীক্বতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্য নিজের বিকাশ লাভ, আর সাধনের মাধ্যম তার দুটি দিক, একটা দিক হলো, হাকীক্বতে আহমাদী, অপর দিক হলো হাকীক্বতে মুহাম্মাদী।

- স্রষ্টার সমস্ত বিকাশটাই যেন হাকীক্বতে আহমাদী। তাই অন্তিম্বু এসে স্রষ্টাকে অনুধাবন করে তার অভুলনীয় প্রশংসা করে নাম পেলেন আহমাদ। এ নাম অর্জিত ধন, এ প্রশংসিত ধন, ধন্য হলো স্রষ্টার প্রশংসায়। প্রথমতঃ হাকীক্বতে আহমাদী প্রকাশ ঘটেছে আত্মার জগতে সৃষ্টির মাধ্যমে। স্রষ্টার প্রশংসার পাত্রকে উপলব্ধি করার মানসে প্রতিকূল পরিবেশে যাচাই করতে পাঠালেন বস্ত্র জগতে। একের পর এক গুরু হলো হাকীক্বতে মুহাম্মাদীর বিকাশ। এ জগত কিছু সময়ের বা ক্ষণিকের, তারপরই ফিরে যেতে হবে আহাদের কাছে। তাই বাকী সময়ের মাঝেই ঘটবে হাকীক্বতে আহমাদীর বিকাশ। এই উভয় হাকীক্বত যাহির হওয়ার মানেই হলো, আহাদ আল্লাহর হাকীক্বত যাহির হওয়া। এ শেষের হাকীক্বতের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে কুদ্রাতের হিকমাতের সবকিছু। এর স্বাশত প্রকাশ ঘটেছে ভাবকের মনে।

মনে হয় এ যুগের এ ত্বরীক্বার প্রয়োজনীয়তা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা নামকরণের উপর চিন্তা করলেই কিছুটা বুঝার কথা।

ত্বরীক্বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার কাছে নিয়ে যায়, পৌছতে কতক্ষণ লাগবে বা হাতে কতটা সময় আছে তা সৃষ্টজীব মানুষের জানা নাই, জানেন একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য আল্লাহ ও আল্লাহর হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামারই ভালো জানেন, তবে আল্লাহ এ বিষয়ে কিছুটা আভাস দিয়ে বলেছেন-

কুনতু কানযাম মাখ্বীযান ফা আহবাবতু আন উ'রাফা ফা খালকতুল খালকা

আমি গুপ্তধন ছিলাম, ভালবাসার অভিব্যক্তিতে আমি আমাকে প্রকাশ করতে চাইলাম। অতঃপর সৃষ্টি সবকিছুই সৃষ্টি করলাম।

সৃষ্টির প্লাট ফর্ম বা ভিত্তি ভালবাসার উপর, তার পরেই দেখা যায় প্রথম সৃষ্টি ভালবাসার ধন নূরে আহমাদী বা নূরে মোহাম্মাদী। হাদীসে কুদসীতে উভয় নামের উল্লেখ আছে। তবে মুসলিম শরীফে হাদীসের উল্লেখ যেভাবে আছে তাতে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা রুহের জগতে আদম আলাইহিস সালামার সাথে যখন সমস্ত রুহের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন কিছু দূরে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়ে আদম আলাইহিস সালাম আরম্ভ করলেনঃ ইয়া আল্লাহ! সর্বাধিক উজ্জ্বল আলোটির পরিচয় কি? আল্লাহ তা'আলা জানালেনঃ তিনি তোমারই সন্তান, যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। তাঁরই নাম আহমাদ"।

যে কুর'আন মাজীদ আখেরী নাবী আহমাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ সাল্লামার উপর নাযিল হলো, তা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে, আদম আলাইহিস সালামার বহু আগে থেকে। সে কুর'আনে মাজীদেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামার উদ্বৃত্তি দিয়ে যে উক্তির উল্লেখ আছে তা লক্ষ্য করার বিষয়-

মুবাশ্শিরাম বিরাসুলিন ইয়া'তী মিম্বাদী ইসমুহ আহমাদ

সুসংবাদ একজন নাবীর আগমনের যিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম

১৩

"আউআলে তুমি যে আহমাদ
আখেরে তুমি সে আহমাদ
হাশের হাতে লেওআইল হামদ
মুহাম্মাদ তুমি যাহেরে।

জড়বাদ এবং আধ্যাত্মবাদ (Spiritualism and Materialism)

বস্তু ও আত্মা দেহ আর প্রাণ বা স্থূল - সূক্ষ্ম সবই জড়বাদ এবং আত্মিক বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত। প্রকাশ ভগ্নি যেমনই হোকনা কেন স্থূল এবং সূক্ষ্মের যেমন নিজস্ব পরিচয় আছে আপন সত্বায় তেমনি আলাদা অস্তিত্বেরও অধিকারী। কর্মকাণ্ডে যেমন স্বকীয়তা বজায় রাখে, তেমনি ভাবে উপলব্ধি করতে পারে উভয়ের সহাবস্থান। পরিলক্ষিত হয় পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন রূপ। যদিও উভয়েরই নিজস্ব কার্যক্রম আছে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, তবুও এক যেন আরেকের জন্য। উভয়ই যেন একই কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। একই উদ্দেশ্য সাধনে তারা সদা নিয়োজিত।

দেহ ও আত্মার সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া খুবই কঠিন, হয়তবা বুঝা যায়, বুঝানো যায় না। তাই বলে মানুষের বুকের একেবারেই বাইরে হলে চলবে কি করে? কারণ, সৃষ্টির চলমান বা গতিশীল যাত্রা মানুষকে দিয়েই সাধিত হবে। তাই বিশেষ গুণাবলীর সমাহার মানুষের মাঝে। জমিনে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, তবে কর্ষণ আর নিয়ম মাত্মিক পরিমিত ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হলেই লাভ করা যায় সুফল। তেমনি মানুষকেও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে হবে চেষ্টা আর প্রয়াসে।

Materialism বা জড়বাদের উন্নতির আগে চলে Spiritualism বা আধ্যাত্মবাদের ক্রমবিকাশ বা আত্মিক উন্নতি। মানুষ যেমন সময়ের দূরত্ব কমাতে চায়, সে সবের ব্যবস্থাও তেমনিভাবে রয়ে গেছে। জড়বাদী মানুষ যেমন অণু পরমাণু গবেষণা করে বহুবিস্তার উন্নতি লাভ করেছে, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে, আল্লাহকে পাওয়ার পথে, সাধিত হয়েছে নানাবিধ উন্নতি।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

ত্বরীকায় আহমাদীয়ায় রয়েছে দশ লাত্বীফার পরে লাত্বীফায়ে খালা-র সন্ধান। এ খালা, শূন্য বা Space-এর অবস্থিতি আর প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। আর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে তাকে কাজে লাগিয়ে লাভ করা যায় বহুবিধ উন্নতি।

মানুষকে ভদ্র সভ্য, বা-আদব হতে হলে মানুষের যে নৈতিক গুণগুলো অর্জন করতে হয়, তা হল 'আযীযী ইনকেসারী নম্রতা তাওআদ্ব'অ। আজ পৃথিবীর সব জায়গায় সব সমাজে, সর্বস্তরে বিনয়ভাবের অভাব। সাধারণতঃ সন্তানরা মা বাপের কাছে, ছাত্রেরা শিক্ষকের কাছে, মুরীদরা পীরের কাছে, অফিসের অধীনস্থরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে, ছোটরা বড়দের কাছে, স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে সশ্রদ্ধ বিনীত ও নম্র নয়। এক কথায় বলতে গেলে, সর্বক্ষেত্রেই এ তাওআদ্ব'অ বা বিনয়ভাবের অভাব। তাই পরস্পরে নাই শ্রদ্ধা, মান্যতা, আর এই মান্যতার অভাবেই দেখা দেয় সৌহারদের, মৈহের ও মমতার অভাব। যে অভাবে সৃষ্টি হয় বিশৃংখলা, অরাজকতা, যা মানুষকে নামিয়ে ফেলে পশুত্বের স্তরে।

মানুষের অবনতি আজ সারা বিশ্বে। এ সংক্রামক রোগ যেন সর্বত্র ছেয়ে গেছে। মানুষের নৈতিকতা (Morality) নেই। যে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে তার জন্য সবাই মাথা ঘামান, দুঃখিত্য মরেন, ভাবেন এর সমাধান কোথায়? সমস্যা যখন আছে তার সমাধান ও থাকার কথা। আল্লাহ জানেন মানুষের মধ্যে কখন কিসের অভাব দেখা দেবে। তাই এর সমাধান হিসেবে ত্বরীকুতে আবিস্কৃত হয়েছে তার ঔষধ, যা গ্রহণ করলে মানুষ হবে নৈতিক দিকে রোগমুক্ত, দুর্বলতা কাটিয়ে

১৬

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

কেন? সাধারণভাবে যা বুঝায় তা হলোঃ (১) প্রধানতঃ সময়ের গুরুত্বই এর বিশেষ কারণ, (২) দ্বিতীয়তঃ যা কিছু করণীয় তার জন্য, যাতে সময়ের অপচয় না হয়, মূল্যবান সময় যেন হেলায় না হারায়, (৩) সর্বোপরি যেন অল্প সময়ে অধিক ফল লাভ করা যায়।

(১) সময়ের গুরুত্বের কথা ধরা যাক। যেহেতু সময় আল্লাহরই দেয়া, তাই আল্লাহই ভালো জানেন, কোন সময়ের গুরুত্ব কম আর কোন সময়ের গুরুত্ব বেশী। স্বভাবতঃ ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার একটা নিকটতম সম্বন্ধ বা নিগুঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তা হলে সময়ের তাৎপর্য উভয় দিক থেকে থাকলেই স্বাভাবিক হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আল্লাহর থেকে দূরে থাকবে তা আল্লাহ চান না, আল্লাহকে ভুলে থাকবে তা ও আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন :-

ওআযকুর রাব্বাকা ফি নাফসিকা তাহাব্বুর্ আও ওআ খীফাতান ওআ দুলাল জাহুরি মিনাল কাউলি বিল গুদুব্বি ওআল আখাল ওআ লা তাকুম মিনাল গাফিলীন

যিকুর করো তোমার প্রতিপালকের, তোমার নিজের মধ্যে স্বকাতরে সভয়ে চুপে চুপে ও অল্প আওয়াযে সকালে ও সন্ধ্যায়, আর তোমরা হয়োনা গাফিলদের দলভুক্ত।

বান্দা যাতে আল্লাহকে ভুলে না থাকে এবং অমনোযোগী না হয়ে পরে, সে বিষয়ে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এ দুটি সময়ে।

আল্লাহর বিধান মত সকলকে কাজ করে যেতে হবে কাজের সময়। কাজ করার শক্তি ও ক্ষমতা দেবেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন, যিনি সমস্ত শক্তির উৎস। সফলতা বিফলতা তাঁরই হাত। কৃতকার্য হলে আনন্দে ফেটে পড়ার কিছুই নেই, তেমনি নেই বিফলে ভেঙ্গে পড়ার মত কিছু। তবে আমাদের চাইতে হবে তাঁর কাছে। দিন শেষে ক্লান্তি বিদূরিত করে তাঁরই কাছে মনকে নিবেদিত করতে হবে। আর তাঁরই মাঝে হয়ে যাবে চাওয়া পাওয়ার হিসাব।

১৮

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

উঠে হবে সন্মিল। মানুষ হবে বিনয়ী, নম্র ভদ্র, পরস্পর থাকবে শ্রদ্ধা আর সৌহারদের বন্ধন, দূর হবে উশৃংখলতা অরাজকতা খুঁজে পাবে শান্তি, পরিবেশ হবে শান্ত। দেখেনি। তাই ত্বরীকুতের অবাস্তব এবং হাস্যকর ব্যাখ্যাদানের অপচেষ্টায় কিছু কিছু মানুষ সত্য থেকে দূরে সরে পড়ছে।

বস্তুতঃ শারী'আত ইসলামের বাহ্যিক (যাহির) দিক আর ত্বরীকুত আভ্যন্তরীণ (বাতেন) দিক, শারী'আত দেহ-ত্বরীকুত প্রাণ। ত্বরীকুতকে দূরে রেখে, শারী'আতকে অবলম্বন করে ধর্মচর্চা করা নিরর্থক এবং ফলহীন। এমনিতর নানাবিধ সমস্যার সমাধান, উন্নতির সোপান এবং অগ্রগতির বাহন স্বরূপ আজ সারা বিশ্বে বিকাশ লাভ করেছে ত্বরীকুত-এ-আহমাদীয়া।

ওআযীফা (সময় প্রশ্ন)

ত্বরীকুতের ইমামগণ ত্বরীকুতপন্থী সালিকদের আত্মিক উন্নতির জন্য অন্ততঃপক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে স্টার্টার সান্নিধ্যে আসার জন্য দো'আ দরুদ সুনির্দিষ্ট নিয়মে পড়ার জন্য জোর দিয়ে থাকেন। সেগুলোই আমাদের কাছে ওআযীফা নামে পরিচিত। প্রধানতঃ সকাল এবং সন্ধ্যায় ফাজর এবং মাগরিব বা নামাযে ইশা'র পর ওআযীফা করার তা'কীদ প্রত্যেক ত্বরীকুয় আছে। বস্তুত যারা প্রকাশ্য ভাবে ত্বরীকুত সম্বন্ধে উদসীন, এমনকি ত্বরীকুতের বিরোধী, তারাও ওআযীফা করার কথা বলে থাকেন। এর মূল কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় তা'কীদের সাথে হুকুম করেছেনঃ

সাকিবুহু বুকরাতাও ওআ আযীলা

সকাল এবং সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করো।

নিয়মানুবর্তিতাই যে সকল সফলতার মূল, সকল কৃতকার্যতার ভিত্তি তা বোধ হয় আর আজকের দিনে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। 'স্বলাত' বা নামায যা মানুষের উপর ফারদ করা হয়েছে, তা শুধু মাত্র দুটি সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং তার সময় নির্ধারণ আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর রাসূল নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন কথা হলো, নির্দিষ্ট সময় দুটির উপর এত তা'কীদ

১৭

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

তাই দিনের শেষে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে তাঁকে ভুলেছিলাম কিনা আর কোন ভুল করে ফেলেছি কিনা। আজ হিসাব না করলেও যে শেষ হিসাবে ধরা পড়ে যাবো তখন জবাব চাইলে কি জবাব দেবো। তাইতো বান্দাকে বাতলিয়ে দেয় কিভাবে ক্ষমা চাইতে হয় -----

প্রভু আমার, জবাব চেওনা

যদি ভুলে থাকি

ভুল করে থাকি

আমায় ধরোনা।

নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে একান্ত ভাবে, তাতে যে যত আনন্দ পায়, সে ততই বিলিয়ে দেয় নিজেকে। বান্দা যখন যিকুর ফিকরের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজের অযোগ্যতা সামনে রেখে জানা-অজানা কৃত অপরাধ ক্ষমা চায়, আর অনুশোচনায় অস্থির হয়ে উঠে, তখনই আল্লাহর দয়ার সাগরে উঠে তুফান। আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করে, শাস্ত না করে ক্ষান্ত হন না। নীরব সান্নিধ্য উপভোগের জন্য ব্যাকুল মন খুঁজতে থাকে আরো নিবিড় করে পাওয়ার মত পরিবেশ।

ঘুমকে হাদীস শরীফে ছোট মূত্য় বলে বলা হয়েছে। মানুষ যখন সারা দিনের ক্লান্তির পর ঘুমে গা এলিয়ে দেয়, আর একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিগত সময়টিতে ইতি টেনে নুতন যাত্রা শুরু করে তখনও তাঁর প্রতিপালক আল্লাহকেই সাখী হিসাবে মনে করে আশ্বস্ত হয়। এ যাত্রা অনির্দিষ্ট কালের, শেষ যে কখন হবে তা জানা নেই। এ ঘুম যদি আর না ভাঙ্গে!

আল্লাহরই নামে যখন নিদ্রা-বিভোর মানুষকে মিনারার চূড়া হতে মুআযযীন আল্লাহরই দরবারে যখন হাযিরী দিতে ডাকে, তখন বান্দার পাগলপারা মন ব্যাকুল হয়ে উঠে, যেন সে ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যই তার প্রাণ আবার ফিরে পেলো। সে তখন শান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, শান্ত পরিবেশে দেহ মন পবিত্র করে মহান মহীমের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে, আর বিনিময়ে যেন এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তার মন, মনটা যেন ভরে উঠে কানায় কানায় নতুন উদ্দীপনায়, শক্তি আর সাহসে। সে এখন দুর্বল নয়।

১৯

তাই তার সামনে এমন কোন কাজ নেই যা দুর্জয়, তার সাথী তিনি, যিনি সমস্ত শক্তির আধার, তাঁরই ইচ্ছাতে যেন এ যাত্রা। কারণ, এ ডাক যে প্রেমের ডাক, এ যে কল্যাণের ডাক।

বান্দার দিক থেকে যে সময়ের গুরুত্বটা কতটুকু তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। সকাল বেলার কথাই ধরা যাক। যদি কারো কাছে চাওয়ার প্রশ্ন উঠে, তখন প্রথমে আমরা ভাবি মনের অবস্থার কথা, মেজাজের কথা, মূড, (mood) এর কথা। মন মেজাজ ভালো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না। ভালো কথাও শুনতে ইচ্ছা করেনা। মনের কথাও সুন্দর করে গুছিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কথা স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী হয় না। সাদর সন্তোষগুণও মন মেজাজ সুস্থ না থাকলে হয়ে উঠে কটুক্তির মত। এক কথায় যা মন মেজাজ ভালো থাকলে হয়, মন মেজাজ ভালো না থাকলে তা হয় না। তাই সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রতিকূল অবস্থার ভাটা পড়ার সময়। তেমনি রিপু শত্রুর দুর্বল মুহুর্তে নিজের লাভ লোকসানের হিসাবটা ক্ষতিয়ে দেখা একটা বিশেষ সুযোগই বটে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে “Prevention is better than cure” নিরাময় থেকে নিবারণ শ্রেয়, অর্থাৎ রোগ সারানো থেকে রোগ যাতে না হয় তা দেখাই বেশী ভালো।

এর প্রয়োগ ক্ষেত্র এ দু'সময় হওয়াই স্বাভাবিক। এ দু'টি সময়েই নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে নিজেকে সবল করে নেয়াই বুদ্ধিমানের ও জ্ঞানীর কাজ।

(২) দ্বিতীয়তঃ কথা আসে এ দু'টি সময়ে কি কি করণীয় তার উপর বিশেষ সময়ে আমরা যা কিছু করি, পড়ি বা বলি তার হিসাবটা দেখতে হয়। আল্লাহ্ মহান পাক-পবিত্র ও তিনি মহান পরাক্রমশালী সব ক্ষমতার অধিকারী, ক্ষমাশীল দয়ালু এমনভাবে নানা বিশেষণে আল্লাহকে ডেকে তার ক্ষমা পেতে চাই। দয়ার ভাগী হয়ে ভালবাসার পাত্র হতে চাই।

এ আশায় সফলতা লাভ করতে হলে আল্লাহর বিধান মতে আল্লাহরই প্রিয় হাবীব স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লামার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেন আমাদের সামনে অনুকরণের একটা মডেল তুলে ধরেছেন। অতএব তাঁর সাথে ভালবাসার

২০

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

করা যায়। সমস্যাযুক্ত সংসারে সময়ের সাথে তাল রেখে মানুষ জাগতিক সব কাজ সমাধা করে নিশ্চিন্তে আল্লাহর আরাধনায় মনোনিবেশ করবে আর হাজার হাজার বার এক এক নামের জপ করবে তা এ জড়বাদের যান্ত্রিক যুগে না হবারই কথা। কিন্তু মানুষ যে অবসর মুহুর্তে জড়বাদের চাপ থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চায়, তাই তার সে অবসর সময়টুকু যথার্থভাবে কাজে লাগাতে না পারলে যে আত্মার তৃষ্ণা নেই। এহেন মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে ধর্মকে বাজারজাত করার জন্য সুলভে একে লাখ, সাত লাখ, উনপঞ্চাশ লাখ সাওআব দেখিয়ে প্রলুব্ধ করতে চায়। কিন্তু এই বিকি-কিনিতে সরল প্রাণ মানুষ যে বিকে যায় না তা নয়। সরল প্রাণ মানুষ মনে করে তারা যেন অনেক ছর-গেলমান বিশিষ্ট বেহেশত ইতিমধ্যেই হাত করে ফেলেছে। এর তৃষ্ণা কিন্তু কম নয় অন্ততঃ পক্ষে আপাতঃ মধুর।

আগের কথাগুলো থেকে আমরা স্পষ্টই ধরে নিতে পারি যে, সাওআব আর বেহেশতের ছর-গেলমানই মানুষের জীবনের কাম্য নয়।

ধর্মের সৌন্দর্য্য, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই নিহিত। ফারয, ওআজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব, মুসতাহসান অন্যান্য সমস্ত হুকুম আহকাম নিজ নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। দশটি সুপারী গাছ যেমন একত্রে বেঁধে দাঁড় করালে একটা তাল গাছ হয় না, তেমনি কয়েকটা মুস্তাহাব একত্রে দাঁড় করালেও ফারযের রূপ ধারণ করে না। যেমন কিছু লোক বহু হাজ্জের সাওআবের লোভ দেখিয়ে ফারয হাজ্জ হতে বিরত রেখে সে সমস্ত টাকা পয়সা ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যয় করাকে হাজ্জ করা থেকে অধিক শ্রেয় মনে করে। এখানে শ্রেয় আর অশ্রেয়ের প্রশ্ন উঠে না। যা ফারয তা ফারয, সুন্নাহ সুন্নাহই আর যা নাফল তা নাফল। এটাই শৃংখলা।

ফারয 'ইবাদাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে হুযুরী ক্বাল্ব বা মনোযোগের উপর। মনোযোগের সাথে আল্লাহর 'ইবাদাত মানেনই হলো তাতে অনুরাগ আছে, আবেগ আছে, অলসতা আর অমনোযোগিতা নেই। তার কাজ, তার 'ইবাদাত যাতে অনুপযোগী না হয়ে পড়ে, সেজন্য সে ভীত-সন্ত্রস্ত। কোন কিছু পাওয়ার থাকলে তা পাওয়া নির্ভর করে চাওয়ার উপর। চাওয়ার দোষে বঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি চাইতে ভুল করলে ইচ্ছাপূর্ণ বস্ত্র না হয়ে বিপরীত বা অন্য কিছু হাতে আসে, যা কবির নিজের কথায় বুঝাতে চেয়েছেন

২২

সম্পর্ক স্থাপন করে স্বাভাবিক চরিত্রে, আচারে ব্যবহারে, ধ্যানে-ধারনায়, চিন্তায় তারই অনুসারী হিসেবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমেই জীবনের স্বার্থকতা। এজন্য আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ ব্যবস্থাপত্র বা তেমন কতকগুলি ওআযীফা ও যিক্র ফিক্র নিয়মিত আদায় করার জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লামকে মুহাব্বাত করা যায় মুহাব্বাত পাওয়া যায়। কারন, আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লামকে বাদ দিয়ে আল্লাহর মুহাব্বাতে গদগদ ভাব মুনাফেকারই শামিল।

(৩) এবার শেষ দিকটা একটু বিচার করে দেখা যাক। কারণ এ যুগ রকেটের যুগ, পরমাণু বিশ্লেষণের যুগ, বস্ত্র জগতের উন্মত্তি এবং ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ ধাপ। বস্ত্র জগতে আজকের দিনে মানুষ যা উন্মত্তি লাভ করেছে, আধ্যাত্মিক জগতে তা বহু পূর্বেই করার কথা। বিনা তারে বাক্যলাপ টেলিভিশন ও এ জাতীয় উন্মত্তি অবস্থার অনুরূপ বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। বেশী দূরে না যেয়ে আখেরী নাবী স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওআ আলিহি ওআ সাল্লামার যুগ থেকেই যদি ধরা যায় তা হলে এর প্রমাণ মিলবে অনেক। খালীফাতুল মুসলেমীন হাযরাত 'ওমার (রাঃ)-এর মাদীনার মিযারে খোৎবা রত অবস্থায় সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এ শক্তিতে শক্তিশালী হতে নাবী বা স্বহাবা হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। এ শক্তি বা গুণ অর্জনের উদ্দেশ্য ভবিষ্যত-বজা হওয়া, মোজেনা বা কেরামতি যাহির করা নয়। আল্লাহকে অনুধাবন করার ক্ষমতা অর্জনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিছু সংখ্যক লোক সমাজে এমনি একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন যে, আধ্যাত্মিক চর্চা যারা করেন বা মা'রিফাত বিশেষজ্ঞগণের কাজ হলো মানুষের ভবিষ্যত বলে দেয়া, রোগ বলাই সারানো আর যাকে যা বলে দেবে তা যেন আলাদিনের চেরাগের মত ফলে যায়। বস্ত্রত তারা আধ্যাত্মিক চর্চার নামে যা করেন তা হলো জ্যোতিষী আর 'আমালীয়াতের চর্চা, জীনি আর হামাযাত শায়ত্বানের খেলা। কোন রকমে 'পীর' নাম খোলাতে পারলেই হলো, বাস্ কাজ হাখিল। যা প্রকৃত কাজ, তার কেউ ধারও ধারেনা।

কিসে অল্প সময়ে অতি সহজে অধিক সফল লাভ করা যায়? সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সে যিক্র ফিক্র ওআযীফা উত্তম, যা নিয়মিত আদায়

২১

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

“যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই, তাহা চাই না।”

ত্বরীক্বতের ইমামগণ সকল প্রকার 'ইবাদাতই মনোযোগের সাথে করার জন্য, বিশেষ ভাবে সচেতন হবার কথাই বলে থাকেন, কিভাবে মনোযোগী হওয়া যায় সে দিকে পরিচালনা করে থাকেন।

ফারয ওআজিব এমনকি নাফল নামাযেরও নিয়ত আছে। তাই সমস্ত 'ইবাদাতেই নিয়তের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, সেজন্য ত্বরীক্বতের ইমামগণ প্রত্যেকটা সর্বক্বের প্রারম্ভে নিয়ত করার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন।

সাওআব রেসানী

যিক্র ফিক্রের প্রারম্ভে সাওআব রেসানী করার নিয়ম আছে। দো'আ দরুদের পর সংক্ষিপ্ত মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে 'ইবাদাতের তৌফিক চাওয়া, আর ত্বরীক্বতের ইমামদের খাস তাওআজ্জু আরজু করাই সাওআব রেসানীর প্রধান উদ্দেশ্য।

নিয়মঃ

দেহ মনকে প্রবৃত্ত করে আল্লাহর দরবারে ধর্না দিতেছি এ খেয়ালে জানা-অজানা সমস্ত কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে তার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করার জন্য পড়তে হবে তিনবার ---

আল্লগফিরুল্লাহা রাক্বী মিন কুন্নি যাখিও ওআ আত্বু ইলাইহি

আল্লাহ তাঁর আপন করুণায় তাঁর দরবারে ক্ষমা চাওয়ার এবং তাঁকে ডাকার যে সুযোগ দিলেন তার গুরুরিয়া হিসাবে সুরাহ-এ-ফাতিহা বা আলহামদুলিল্লাহ সুরাহ বিসমিল্লাহ সহ একবার।

Sincerity বা নিষ্ঠা প্রত্যেকটি চিন্তা বা কাজ সুন্দর বা মঙ্গলময় হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত, একেই 'আরবীতে বলা হয় ইখলাস বা খুল্লিখিয়াত। একথা স্মরণ রেখে ত্বরীক্বতের ইমামগণ, পীর, গুস্তাদ, মা-বাপ, আযীয-স্বজন সকলের রূহের আল্লাহর তরফে হাদীয়া হিসেবে পড়তে হবে তাঁরই কালামের

২৩

যা তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাঁর শানের পরিচায়ক সুরাহ-এ-ইখলাশ (কুল্‌হুআল্লাহ্‌ আহাদ) বিস্মিল্লাহ্‌ সহ তিনবার।

আল্লাহ্‌ চান আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র দরবারে কিছু চাইতে হলে যেন হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার মাধ্যমে বা ওআসীলা ধরে চায়। তা ছাড়া স্বালাত দরুদ আল্লাহ্‌ স্বয়ং ও ফেরেশতাগণ পেশ করে থাকেন। দেয়ার প্রার্থে যেন নিজের সর্বশ্রম এমনকি মনকে উজাড় করে দেয়ার পরে আর কিছু না থাকে। তেমনিভাবে নিম্নোক্ত দরুদ পড়তে হবে তিনবারঃ

আল্লাহুমা স্বপ্নি ওআসাল্লিম ওআ বারিক ‘আলা হাবীবিকা সাইয়্যিদিনা আহমাদ, আব্দিকা ওআ রাসূলিকা আফদ্বালা স্বলাওআতিকা ওআ ‘আলা আলিহী ওআ স্বহুবীহী ওআ মাও ওআলাহ ফী কুল্লি লামুহাতিও ওআ নাফাসিম মিন কুল্লি যাব্বরতিন ‘আদাদা ইলমিকা।

হে আল্লাহ, স্বালাত নামিল করেন আপনার হাবীব আমাদের আক্বা মাওলা হাযরাত আহমাদ মুজতাবা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার উপর যা আপনার স্বালাত সমূহের মধ্যে উত্তম, এবং তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও প্রিয় স্বহাবাগণের উপর, আর তাদের উপরও যারা তাঁকে ভালবাসেন, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে, আপনার জ্ঞানে যত সংখ্যা আছে ততো সংখ্যায়।

তারপরে মুনাজাত :

আয় আল্লাহু, আমি যা কিছু পড়লাম তার ভুলত্রুটি মাফ এর দরখাস্ত করছি। এর সাওআব বহুগুণে বাড়িয়ে আখেরী নাবী হাযরাত আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লালামার জন্য পেশ করার আবেদন করছি, যিনি আপনার বান্দা হওয়ার নমুনা, যাকে আপনিই পাঠিয়েছেন। সমস্ত নাবী আলাইহিমুস স্বালাত ওআস সালাম, পবিত্র পরিবারবর্গ স্বাহাবা কিরাম, ভূরীক্বতের ইমামগণ, তাবিন্‌ন, তাবি তাবিন্‌ন, আঈম্মা ও মুজতাহিদীন, ফুক্বাহা, ‘উলামা ও মুহাদ্দিসীনদের বন্টন করার

লাত্বীফা মানে সূক্ষ্ম বস্তু। সব লাত্বীফাই সূক্ষ্ম এবং চর্ম চক্ষে দেখা যায় না, তবে এগুলো বলার ক্ষমতা রাখে। তাই এগুলো বাতেনী মুখ নামেও অভিহিত।

যেহেতু লাত্বীফাগুলো অস্বক্সে লোহায় মরিচা ধরার ন্যায় গুণাহের কারণে জং বা ময়লা ধরে যায়, তাই সেগুলোকে শান যন্ত্রের মত যিক্রের মাধ্যমে পরিস্কার করতে হয়। এরই নাম বাতেনী ‘সফায়ী। তা’ হলেই লাত্বীফাগুলোর যে নিজ নিজ আলো আছে তা জ্বলে উঠবে। লাত্বীফাগুলো যিক্র করা শিখবে। তারপর যিক্র করতে থাকলে ধীরে ধীরে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। নিয়মিত লেগে থাকলে নিজের অবস্থাকে আরো উন্নত করে সৃষ্টি রহস্য জানতে পারবে। আল্লাহ্‌ ও তাঁর হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। আল্লাহ্‌কে মাহুব্ব করে নিতে পারলে আল্লাহ্‌ জানালে, ভেদের অনেক কিছুই জানা সম্ভব হবে।

এগারো লাত্বীফার যিক্র মুরাক্বাবা

প্রত্যেক লাত্বীফার আলাদা ভাবে যিক্র মুরাক্বাবা করতে হবে। একটি জারী হওয়ার পর শুরু করবে পরবর্তীটি, প্রত্যেক লাত্বীফার একই নিয়ম। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিক্র মুরাক্বাবা প্রত্যেক লাত্বীফায় বিভিন্ন নির্ধারিত মাক্বামের ফায়েয আসে ও হাক্বীক্বত যাহির হয়। চক্ষু জিহ্বা, গুণ্ড বন্ধ করে বাতেনী এক দৃষ্টিতে প্রথম ছয় লাত্বীফাতে যিক্র মুরাক্বাবা করার সময় লাত্বীফাটির রং দেখছি এই বন্ধধারণা নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে হবে। বাকী গুলোতে মাথা হতে পা পর্যন্ত সারা শরীরের দিকে, যতক্ষণ এক সবক্বু পাকা যায় ততক্ষণ।

যিক্র করার নিয়ম : লাত্বীফা হ’তে আল্লাহ্‌ শব্দ নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে নাক দিয়ে বের করে দিবে। পুনরায় নিঃশ্বাস টানার সময় ‘আল্লাহ্‌’ উচ্চারণ নাকের মধ্য দিয়ে লাত্বীফায় ঢুকাবে। অপর কথায় নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে ‘আল্লাহ্‌’ আর টানার সাথে ‘আল্লাহ্‌’ যিক্র করবে, যেন লাত্বীফা হতে বের

নিবেদন করছি। খাশ্ব করে পীর সাহেব ক্বিবলাহ, দাদা পীর সাহেব ক্বীবলাহ, বাপ-মা, আত্বীয়-স্বজন, পীর ভাই, পীর বোন মু‘মিনীন মু‘মিনাত সিলসিলার সমস্ত সালিকদের এবং নেদায়ে ইসলামের সকল কর্মী ও সদস্যদের ভাগী করেন, খাস করে ইমামুত ভূরীক্বত হাযরাত আল্লামা শায়খ সায্যিদ শায়খ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী রাদিআল্লাহু আনহু কে ভাগীকরার আবেদন করছি। আপনার খাস রাহমাতে, যাদের উপর সাওআব রেসানী করলাম, সকলের ওআসীলায় আপনার খাস রাহমাতে, আমাদের সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ চাই। আপনার খাস রাহমাত ও হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআসাল্লামার খাস তাওআজ্জুহ চাই। ভূরীক্বতের ইমামগণের খাস তাওআজ্জুহ চাই। প্রত্যেকটা সবক্বের পুরাপরি হাক্বীক্বাত যেন যাহির হয়। আমাদের দো‘আ ক্বরুলের আশা করছি বহাঞ্জে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওয়াসাল্লাম।

যিক্র ফিক্র (লাত্বীফা প্রসঙ্গে)

আধুনিক বিজ্ঞান মতে অগণিত অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে যে মানুষটি সৃষ্টি তার প্রত্যেকটা অণুই সক্রিয়। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানীগণ বলেন- মানুষ যেমন মুখে কথা বলে, ভেতন ভাবে প্রত্যেকটা অণু-পরমাণুই বলার ক্ষমতা রাখে। মানুষের শরীরের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলো বিশেষ লাত্বীফা আছে, প্রত্যেকটারই অবস্থান আছে অদৃশ্যভাবে, ভাব প্রভাব আছে, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বিদ্যমান, আবার কতগুলি সারা শরীরেই অণু-পরমাণু রূপে বিরাজমান, তাই সেগুলোকে মুটামুটি ভাবে এই পাঁচটি উপাদানে-পানি, আগুন, মাটি, বাতাস ও শূন্য (আব, আতশ, খাক, বাদ ও খাল)-ভাগ করে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে লাত্বীফাগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান স্বীকার করা হয়, তার মধ্যে প্রধান হলো ক্বাল্ব বা মন, আর তার সাথে আছে আরো পাঁচটি যথা-রুহ, সির, খাফী, আখফা ও নাফস। মোট এই এগারোটি বিশেষ লাত্বীফা।

হয় আল্লাহ্‌ আর লাত্বীফায় ঢুকে আল্লাহ্‌। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় লক্ষ্য করবে ছ-এর সাথে আমার লাত্বীফা হতে বের হচ্ছে তামাম গায়রুল্লাহ - আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর যত কিছু আছে- গুনাহের পর্দা, যুলমাত, ওআসওআসা ক্বাসওআত, গাফলাত, রীয়া, ফাখর, কীনা, হাসাদ, বোগয ফাদেকী, ফাজেরী, মুনাফেকী, বখিলী, বদখৈয়াল ও বদখাশ্বলাত ইত্যাদি এবং হয়ে যাবে পাক ও পবিত্র। নিঃশ্বাস টানার সময় খেয়াল করবে, আমার লাত্বীফাতে আল্লাহ্‌ শব্দ ঢুকে পড়ছে। পবিত্র আল্লাহ্‌কে আমার লাত্বীফায় স্থান দিচ্ছি। এভাবে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিক্র করতে থাকবে।

মুরাক্বাবা করার নিয়ম : একই লাত্বীফায় কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ছেড়ে টেনে যিক্র করার পর, নিঃশ্বাস বন্ধ করে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ লাত্বীফায় যিক্র বা ধ্যান করতে হবে। অবশ্য এক এক লাত্বীফায় যিক্রের বিষয়বস্তু বা ধরনে তফাত আছে।

লাত্বীফা - এ- ক্বাল্ব

বাতেনী মুখের মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্বাল্ব। অন্যান্য লাত্বীফার মত ক্বাল্ব শুধুমাত্র বিশেষ একটা দিকে সক্রিয় নয় বরং বহুমুখী। হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার কথায় বলতে গেলেঃ যা ভাল থাকলে সব ভাল, আর যা খারাপ থাকলে বা মন্দ হলে সবই মন্দ।

ক্বাল্বের অবস্থান বাম দুধের বোঁটার দু‘আঙ্গুল নীচে, রং হলদে নুরানী।

লাত্বীফায় যিক্র করার নিয়মে ক্বালবে কিছুক্ষণ যিক্র করার পর যিক্র শুরু করতে হবে নিয়মানুসারে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করার বিষয় হলো ক্বাল্ব আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌, যিক্র করছে কিনা, স্বাভাবিকভাবে কাল্বের সাড়া না পাওয়ারই কথা, কারণ প্রতিটি গুনাহে যখন ক্বালবে একটা কাল দাগ পড়ে, আমার অগণিত গুনাহে কাল দাগ পড়তে পড়তে আমার ক্বাল্ব পাথর হয়ে গেছে, এমনকি পাথরের চাইলেও বেশী শক্ত হয়ে গেছে।

তাই এ অবস্থা দূর করার জন্য ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে মনে মনে আরজু করতে হবে-কুওআতের ফায়েয আমার ক্বালবে আসুক, আমার ক্বালবের ক্বাসওআত, গাফলাত, কঠিনতা দূর হয়ে যাক, গুণাহের পদাঙ্কলো ফেটে যাক। দুনিয়ার সব কিছুর মুহাব্বাত দূর হয়ে যাক।

এ অবস্থায় ক্বালবের অবস্থা ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে। পীর সাহেব ক্বিবলাহ এবং তুরীক্বতের ইমামের খাস তাওআজ্জিহ আরজু করতে হবে। ক্বালব কিছুটা জারী হলেই চলবেনা, সকল সময় জারী রাখতে হলে আরও অনেক কিছু করণীয় আছে। তাই আরজু করতে হবে- আমার সংকীর্ণ ক্বালব কুশাদা-প্রশস্ত হয়ে যাক। ক্বুসুবুল মু'মিনীনা 'আরশুন্নাহ- মু'মিনীনের ক্বালব আল্লাহর 'আরশ। সমস্ত আসমান যমীন যেমন 'আরশের বেষ্টনীতে; আমার ক্বালবও ততটা প্রশস্ত হয়ে যাক। তা'না হ'লে আমি পুরাপুরি মু'মিন বলে দাবী করতে পারব না।

আবার নিঃশ্বাস ছেড়ে টেনে চলবে যিকুর, কিন্তু ফিকরের সময় একটু ব্যতিক্রম হবে। তা হলে এবার হু দ্বারা খেয়াল করতে হবে- 'তিনি' 'আল্লাহ আল্লাহ', মানে তিনি আল্লাহই আল্লাহ, যাকে সমস্ত মাখলুকাৎ, সারা জাহান আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছে, আমিও তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে নিলাম। আমি আল্লাহর এবং আল্লাহ আমার।

আমার আল্লাহর নাম কত মধুর। যে এর স্বাদ একবার পেয়েছে সে আর জীবনে এ নাম ছাড়া, ভুলেনা। এ নামের স্বাদ আমাকে পেতেই হবে। তাই আরজু করতে হবে- আমার ক্বালবে তাল্যযুয়ে যিকুরের ফায়েয আসুক, আল্লাহ নামের মধুরতার স্বাদ আমার ক্বালবে পয়দা হয়ে যাক। আমিও এ নাম ছাড়ব না। কত মধুর নাম আল্লাহ, কত মধুর আল্লাহ আমার।

যাঁর নামে এত মধু, তার ভালবাসা মুহাব্বাত না জানি কত মধুর! সে ভালবাসা আমাকে পেতেই হবে। তাই আমি আল্লাহর মুহাব্বাত আরজু করছি। মুহাব্বাতের ফায়েয আমার ক্বালবে আসুক, আল্লাহর মুহাব্বাতে আমার ক্বালব ভরপুর হয়ে যাক।

ইউহিব্বুহুম ওআ ইউহিবুনাহ

২৮

আমি সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করছি, হাযরাত আদম (আঃ) যেমন একটি বার আল্লাহকে নারায় করে কয়েকশত বৎসর অনুশোচনায় কেঁদেছিলেন আর বলেছিলেনঃ-

(রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওআইল্লান্না তাগফিরলানা ওআ তারহামনা লানা কুনান্না মিলান খাসেরীন)

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার উপর যুলুম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাকে মাফ না করেন, দয়া না করেন, তা'হলে আমি বরবাদ হয়ে যাব।

আমিও আমার বরবাদী জিন্দগীর কথা স্মরণ করে যেন সেই আরাফাতের ময়দানে সবে বলছি.....। কিন্তু আমি এত বড় গুনাহগার যে, অপরাধের কথা বলতে পারছি না, অসহায়ের মত শুধু ডাকছি আল্লাহ আল্লাহ।

নিয়াত : আমি আমার ক্বালবের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার ক্বালব পীর সাহেব ক্বিবলার ক্বালবের ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওজ্জিহ আছে, আল্লাহ আল্লাহ যিকুরের ফায়েয আমার ক্বালবে আসুক। আমার ক্বালব মুহাব্বাতের সাথে যিকুর করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-রুহ

গুরুত্ব হিসাবে বিচার করলে লাত্বীফা সমূহের মধ্যে বিশেষ স্থান লাত্বীফা-এ-রুহের। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সকল বাহন যেমন সকল জায়গায় পাওয়া যায়না তেমনি ভাবে সকল বাহনই সকল গন্তবাহানে পৌঁছে না। উড়োজাহাজ সব রাষ্ট্রায় নামতে পারেনা। তাই তার জন্য চাই বিমান বন্দর, তেমনি সব বিমান বন্দর থেকে রকেট ছাড়া যায় না।

সব ইন্দিয়ের যেমন সব ক্ষমতা নেই, কাজ আলাদা, তেমনি লাত্বীফায়ে রুহের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ দিক হল সম্পর্কের, যা আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ স্থাপন করে দেয়, দুরত্ব কমিয়ে কাছে এনে দেয়, অপরিচিত সত্ত্বাকে আপন করে ভালবাসার পাত্র করে দেয়। দু'টি তার যেমন একটি আর একটির দিকে রুজু হলে বা ঝুকে পড়লে, নিকটতম হলে একসাথে জুড়ে বেঁধে দেয়া যায়, তেমনি ভাবে লাত্বীফায়ে রুহ ঝুকে পড়লেই, সৃষ্টি হয় এক

তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে। এ আয়াত মাঝে মাঝে পড়তে হবে।

আল্লাহর একদল বান্দা আছেন যারা নিজেদের ক্বালবকে খালি করে আল্লাহর মুহাব্বাতে ভরপুর করে নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে থাকেন, অস্থির থাকেন। আল্লাহ সে সব পাগল বান্দাদেরকে মুহাব্বাতে ভরপুর করে দেন, ভালবাসা দিয়ে শান্ত করেন। সে বান্দারাও আল্লাহকে ভালবাসতে থাকেন। যাঁদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন আর আল্লাহকে যাঁরা ভালবাসেন আমিও তাদের দলভুক্ত হয়ে যাই। এখন থেকে আমি আমার মুহাব্বাতের আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবো না। আমি মুহাব্বাতের হেরেমে পৌঁছে যাই। যিনি আমাকে মুহাব্বাত করেন, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে রাহমাত-দয়াও করেন, তাঁর দয়া ছাড়া আমার উপায় নাই। আল্লাহর রাহমাতই আমার একমাত্র সখল। আমার রাহমাতের আল্লাহ যে পরম দয়ার মালিক।

হযার রাহমানুর রাহীম

মাঝে মাঝে পড়তে হবে। ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে- আমি আল্লাহর রাহমাতের সাগরে ভাসতে থাকি, সমস্ত মুসিবৎ আমার জন্য রাহমাত হয়ে যাক।

আমার মুহাব্বাতের আল্লাহ ও রাহমাতের আল্লাহকে আমি গুনাহ করে করে নারায় করে ফেলেছি। আল্লাহ আমাকে মাফ না করলে যে আমি বরবাদ হয়ে যাব, তাই মাগফিরাত কামনা করছি। মাগফিরাতের ফায়েয ক্বালবে আসুক- ভাবতে হবে আর মাঝে মাঝে পড়তে হবে- ইন্নাহু হযাল গাফুরুর রাহীম এবং ইন্নাহু রাব্বী গাফুরুর রাহীম।

এমন বন্ধুকে কি কেউ কোন দিন নারায় করে। জীবনে একটি বারের জন্য যদি নারায় করে থাকি তার অনুশোচনায় সারাটি জীবন কাঁদা উচিত, কিন্তু আমি এক দিনও চিন্তা করে দেখিনি, অনুশোচনায় অস্থির হইনি, একফোঁটা পানিও আমার চোখে আসে না। গুনাহ করে করে আমার ক্বালব পাষণ হয়ে গেছে। আমি প্রত্যেকটি গুনাহ আল্লাহর দরবারে তুলে ধরছি,

২৯

বন্ধন, এ রুজু হওয়া বা ঝুকে পড়াকে 'আরবীতে বলা হয় ইনাবাত। প্রত্যাবর্তন করার অর্থেও ইনাবাত ব্যবহৃত হয়। রুহের অবস্থান ডান দুধের বোটার দু'আঙ্গুল নীচে, রং লাল নুরানী। এ লাত্বীফা যখন যিকুর ফিকরের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে হয় শক্তিশালী, অন্ধকার বিদূরিত করে হয় আলোকময়, আর সেই আলোকে খুঁজে পায় পরম সত্ত্বাকে, তখন সে সব কিছুর আকর্ষণ ছিন্ন করে আত্মাভোলা হয়ে ধাবিত হয় পরম সত্ত্বার দিকে, একেবারে রুজু হয়ে যায়, ঝুকে পড়ে ভালবাসার টানে আর লাভ করে পূর্ণ তৃপ্তি। বস্তুতঃ তারই জন্য মানব জীবনের এ সাধনা।

তাই নিয়মানুসারে যিকুর শিখাতে হবে লাত্বীফা-এ-রুহকে, ফিকুর করতে হবে রুহের অবস্থার উপর। ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে- আল্লাহর আকর্ষণ ছাড়া, আল্লাহর টান ছাড়া যতকিছুর টান আছে, সব ছিন্ন হয়ে যাক। আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার পথে যত আন্তরায় আছে সব দূর হয়ে যাক, আমার রুহ সাফ, পরিস্কার হয়ে যাক, লাত্বীফা-এ-রুহের মুখ খুলে যাক, আল্লাহ আল্লাহ যিকুর জারী হয়ে যাক। হাযরাত নূহ (আঃ), হাযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওআসীলায় ফায়েয আসুক, তাঁদের হাল হাকীকত ও কাইফীয়াত আমার হয়ে যাক, ইনাবাত বলতে যা বুঝায় তার পূর্ণ হাকীকত যাহির হয়ে যাক। আমি আল্লাহর দিকে খালেশ ভাবে রুজু হয়ে যাই।

নিয়াত : আমি আমার লাত্বীফা-এ-রুহের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার রুহ পীর সাহেব ক্বিবলার রুহের ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ আল্লাহ যিকুর ও ইনাবাতের ফায়েয আমার রুহে আসুক। আমার রুহ যিকুর করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-সির

মানুষ কেন দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, চাই সে দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি হোক বা মানুষের প্রতি। যে মায়া আল্লাহর জন্য, বা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানুষের জন্য থাকার কথা, তা না থাকলে তার বিপরীত দিকটা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে মানুষের স্বভাবে আচরণে। সে হয়ে উঠে দুনিয়ার জন্য মায়ামত্ত, আর এই মায়ার আধার হলো সির লাত্বীফা।

আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু প্রতি বা যত কিছু প্রতি মায়া থাকুক না কেন তাকে বলা হয় মোহ। এ মায়া বা মোহ সমস্ত কাজে-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে সির লাত্বীফার মধ্য দিয়ে। আল্লাহর প্রতি যদি বান্দার মায়া মুহাব্বাত থাকে তা হলে সে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হতে পারেনা। তাকে কোন প্রলোভনই দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারেনা, তাতে ক্রটি বিচ্ছিন্ন ঘটীর সম্ভাবনায় সে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ফাঁকি দেয়া তো দূরে থাক বরং সে নিখুঁতভাবে সমস্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়। পক্ষান্তরে যদি সে আল্লাহর কথা ভুলে যায়, আল্লাহর মুহাব্বাতে তার মনে কোন দাগ না কাটে, আর দুনিয়ার মোহ, লোভ লালসায় প্রভাবান্বিত হয়ে সে দুনিয়ার ভলবাসায় মত্ত হয়ে যায়, তা'হলেই সম্ভব হয় আমানতের জায়গাতে খেয়ানত, পাহারা দেয়ার বদলে চুরি। মানুষ দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে গেলে দেখার ক্ষমতা থাকেনা ভাল কি মন্দ, বিচার করতে পারেনা, ন্যায় কি অন্যায়, হারিয়ে ফেলে সাধারণ কান্ডজ্ঞান, অবোধ করে যেতে পারে যুলুম অত্যাচার আরো কত কি।

তাই, যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দাদের হক্ক আদায় করতে হয়, দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়, তা'হলে নিজের ভিতরে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আর জাগিয়ে তুলতে হবে দুনিয়ার প্রতি, সংসারের প্রতি অনাশক্তি, উদাসীনতা। দুনিয়াবী মিথ্যা, মোহ, মায়া, লিলা ত্যাগকেই বলা হয় যুহুদ আর এই যুহুদই হলো ইসলামী অর্থে সংসার ত্যাগ।

দুনিয়াবী কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে ঘুরাফেরা করা, যাওয়া পরা বাদ দিয়ে এক ধ্যানে এক স্থানে বসে থাকা অথবা বনে জংগলে চলে যাওয়া এসবকে বলা হয় রাহ্বানিয়াত-বৈরাগ্য, সন্ন্যাস।

রাসুলুল্লাহ স্বল্পালাহ 'আলাইহি ওআ আলাহি ওআ সাল্লামার বাণী-

লা রাহ্বানিয়াত ফিল ইসলাম

কোন প্রকার বৈরাগ্য (সন্ন্যাস) ইসলামে নেই,

সাধারণতঃ সংসারের দায়িত্ব কাজকর্ম বলতে যা বুঝায়, তা পুরাপুরি বজায় রেখে সংসারের মায়া লিলা ত্যাগ করে দুনিয়ার গোলামী করার জন্য নয় বরং সব রকমের কাজ আল্লাহরই জন্য ইবাদাতের নিয়াতে করাই প্রকৃতপক্ষে সংসার ত্যাগ। এই সংসার ত্যাগকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভ্যাস আরও দৃঢ় হয় ইসলামের নির্দেশনানুসারে আল্লাহর দরবারে বাধ্যতামূলক যাবিরীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কয়েম করে, রোযা রেখে, যাকাত দিয়ে এবং হাজ্জ করার মাধ্যমে। নামায ও হাজ্জ রয়েছে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ সংসার ত্যাগ। নামাযে প্রত্যহ পাঁচবার ক্ষণ মেয়াদী, হাজ্জে সপ্ত-দীর্ঘ মেয়াদী, আর রোযা রাখা ও যাকাত দেয়ায় রয়েছে পরোক্ষ সংসার ত্যাগ। দ্বীনী ইলম শিক্ষা, কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ নামায ও যিক্র মুরাক্বাবায় রয়েছে স্বেচ্ছামূলক সংসার ত্যাগ। কেবল জপতপ করা, শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, নিজের উপার্জিত ধন নিজেই ভোগ করা কিংবা জমা করা সংসার ত্যাগ নয়, বরং প্রকৃত সংসার ত্যাগের অন্তরায়।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান মতে যুহুদের ফায়েযা শুধু হতে না পারলে সম্ভব হয়ে উঠেনা সত্যিকার ভাবে স্বেচ্ছামূলক সংসার ত্যাগ। তাই নিয়মানুসারে যিক্র শিখাতে হবে লাত্বীফা-এ-সিরকে, ফিক্র করতে হবে সির-এর অবস্থার উপর। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে ঃ এইক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লোভ লালসা এবং যত কিছু মায়া, মুহাব্বাত আছে সব ছিন্ন হয়ে যাক, আমার সির-এর মুখ খুলে যাক। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র জারী হয়ে যাক। আল্লাহর জন্য সত্যিকার মায়া মুহাব্বাত পয়দা হয়ে যাক। হাযরাত মুসা (আঃ) এর ওআসীলায় ফায়েয আসুক, তাঁর হাল-হাক্কীকাত ও কাইফীয়াত আমার হয়ে যাক। যুহুদ বলতে যা বুঝায় তার পূর্ণ হাক্কীকাত যাবির হয়ে যাক, আমি সত্যিকারের যাবিদ বান্দা হয়ে যাই।

চক্ষু বন্ধ করে একান্ত চিত্তে বুকের কড়ার নিচে সাদা একটি নূর দেখছি এ খেলায়ে নিয়াত করে যিক্র ফিক্র শুরু করতে হবে।

নিয়াত ঃ- আমি আমার লাত্বীফা-এ-সির-এর দিকে মুতাজ্জিহ আছি। আমার সির পীর সাহেব ক্বিবলার সির-এর ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাজ্জিহ আছি। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও যুহুদের ফায়েয আমার সির-এ আসুক, আমার সির যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-খাফী

মানুষ আর অমানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আল্লাহ রাবুল 'আলামীন মানুষকে ভাল মন্দ বুঝার বিবেক দিয়ে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়ে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রকৃত মানুষকে যা মন্দ তা বর্জন করতে হবে, যা অপছন্দনীয় তা থেকে পরহেয করতে হবে, যা শালীনতা বহির্ভূত তা পরিহার করতে হবে। এ কথা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষই বুঝে। তাছাড়া বিবেককে তা'কীদ দেয়ার মত রয়ে গেছে অনেক কিছু। এত বুঝেও যা বর্জনীয় তা মানুষ ছাড়তে পারে না, যা নিন্দনীয় তা পরহেয করতে পারে না।

তবে কি মানুষের চেষ্টা নেই? না কি মানুষের বিবেক কাজ করে না? আমরা বাহ্যতঃ যা দেখি, তাতে অন্ততঃ এ কথা বলা যেতে পারে যে, মানুষ যখন আর সব কিছুই ঠিক মতই করে যাচ্ছে তখন ভাল মন্দটিও ঠিক মত বুঝে। তা'হলে কি চেষ্টার ক্রটি? তাও সঠিক করে বলা যায় না। একটা সাধারণ অভ্যাসের কথাই ধরা যাক, যেমন- বিড়ি-সিগারেট পান করা, এতে স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে কোন লাভ নেই বরং অনেক ক্ষতিরই সম্ভাবনা আছে। তা বুঝলাম যে, অভ্যাস যখন হয়ে গেছে, তখন আর ছাড়া যায় কি করে? কিন্তু যখন থাইসিস বা যক্ষ্মা মোড় নেয়া শুরু করে, আর ডাক্তার তা বারণ করেন, মৃত্যুর ভয়ে তখন সে অভ্যাস ছাড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যা দু'জাহানে ক্ষতিকর সাধারণতঃ তা ছাড়া সম্ভব হয় না

কেন? আর গলদই বা কোথায়?

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানিগণ বলেনঃ- লাত্বীফা-এ-খাফী নামে যে লাত্বীফা পরিচিত, যার অবস্থান কপালে সিঁজদার জায়গায় এবং রং কালো, সে লাত্বীফার অবস্থার উপর মানুষের মন্দ থেকে বাঁচার সক্ষমতা ও অক্ষমতা নির্ভর করে, এ খাফী লাত্বীফা যদি আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করে এবং তাতে তার প্রকৃত আলো বিদ্যমান থাকে তা হলে উচ্চ দরজার তাক্বুওয়া বা পরহেযগারী বা 'অরা' এখতিয়ার করা সম্ভব হয়।

তাক্বুওয়া মানে ঃ- প্রথমতঃ Protection (রক্ষা করা-আব্রক্ষা), দ্বিতীয়তঃ-ভয়-আল্লাহর প্রেম- ভয়। সে প্রেম রক্ষার্থে নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ও মুহাব্বাতে ক্রটি-বিচ্ছুরতির আশঙ্কা, হালাল-হারাম, পাকী-নাপাকী ও ভাল-মন্দ বেছে চলা, পছন্দ অপছন্দ বিচার করে চলা; গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় হারাম কিংবা মাকরুহে জড়িত, পতিত হওয়ার আশংকায় মুবাহ্ব বস্তু ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার নাম তাক্বুওয়া। যিনি পাণ থেকে এমনি ভাবে বেঁচে থাকতে পারেন তাঁকে বলা হয় মুজাক্কী, পরহেযগার এবং তিনিই হলেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।

আল্লাহ বলেনঃ- ইন্না আক্রামাকুম 'ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক মুতাক্কী বা পরহেযগার।

আল্লাহর দরবারে সম্মানিত বান্দা হিসাবে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে নিয়মানুযায়ী খাফীকে যিক্র শিখাতে হবে। আর ফিক্র করতে হবেঃ-

আমার খাফী থেকে অন্ধকারের সমস্ত পর্দা উঠে যাক। পরহেযগারীর পথে

যত অন্তরায় আছে দূর হয়ে যাক। 'অরা' বলতে যা বুঝায় তার পুরাপুরি হাক্কীক্বাত যাহির হয়ে যাক। আমি আউআল দরজার পরহেযগার হয়ে যাই।

নিয়াতঃ- আমি আমার লাত্বীফায়ে-এ-খাফীর দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার খাফী পীর সাহেব ক্বিবলার খাফীর ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও 'অরা'র ফায়েয আমার খাফীতে আসুক। আমার খাফী যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-আখ্ফা

আজকের দুনিয়ায় মনে হয় উপকারীর অপকার করা, কারো নিমক খেলে তার নিমকহারামী করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে কৃত্য হওয়া যেন মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে একে অপরের দানের প্রতিদান উপকারের জবাব যেমন অপকার দিয়ে দেয়, তেমনি আল্লাহর নি'অমাতের প্রতিদানে আল্লাহর জন্য থাকে শুধু নাওকুরী আর নাফরমানী। নিমকহালালী বা নিমকহারামীর অবস্থা সৃষ্টি হয় লাত্বীফা-এ-আখ্ফার অবস্থার কারণে। যদি আখ্ফা প্রকৃত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, অর্থাৎ কলসমুজ্ঞ থাকে, আর নিজস্ব আলোকে দীপ্ত থাকে, তা'হলে অগায়াসে তার থেকে প্রকাশ পায় কৃতজ্ঞতা, অন্যথায় কৃতঘ্নতা।

নাফরমানীর ফলে একে অপরের সাথে হয় তিক্ততার সৃষ্টি এমনকি সম্পর্কচ্ছেদ। তাই সহানুভূতির পরিবর্তে মেলে অবহেলা, ভালবাসার স্থলে আঘাত। এ অবস্থাটি সহজে ধরা পরে মানুষ একই সমাজে বাস করে বলে। কিন্তু মানুষের দান বা অনুগ্রহ যতই বড় দেখা যাকনা কেনো আল্লাহর ক্ষুদ্রতম দানের সাথে তার তুলনা করা যায় না। এমনি কত যে নি'অমাত মানুষের জন্য, তা' হিসাবের বাইরে।

৩৬

আল্লাহর দরবারে শাকের বান্দা হয়ে থাকতে হ'লে নিয়মানুযায়ী লাত্বীফা-এ-আখ্ফাকে যিক্র শিখাতে হবে। আখ্ফার অবস্থান মাথার তালুতে, রং সবুজ, ফিক্র করার সময় ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবেঃ- আমার আখ্ফা থেকে নাফরমানীর পর্দা উঠে যাক, আখ্ফার মুখ খুলে যাক, আমার আখ্ফায় আল্লাহ আল্লাহ যিক্র জারী হয়ে যাক, আল্লাহর অসংখ্য নি'অমাতের মর্যাদা বুঝবার ও উপলব্ধি করার জ্ঞান আমার মধ্যে এসে যাক, আল্লাহর নি'অমাতের না-ওকুরী, নিমকহারামী যেন আমার দ্বারা না হয় সে কাইফিয়াত হয়ে যাক। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করতে করতে দ্বারীক্বাতের ইমামগণের আখ্ফার যে হাল হাক্কীক্বাত কাইফিয়াত হয়েছিল আমারও তা হয়ে যাক। রাসূলুল্লাহ স্বপ্নায়াহ 'আলাইহি ওআ'আলিহি ওআ সাল্মারাম আখ্ফার যে হাল ছিল, সে হাল হাক্কীক্বাত কাইফিয়াত আমার আখ্ফাতে হয়ে যাক। যেভাবে শুকুর গুয়ারী করলে আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দেবেন তেমন শাকের বান্দা হয়ে যাই।

নিয়াতঃ- আমি আমার আখ্ফার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার আখ্ফা পীর সাহেব ক্বিবলার আখ্ফার ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও শুকুরের ফায়েয আমার আখ্ফাতে আসুক। আমার আখ্ফা যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-নাফস

একথা একান্তভাবে সত্য যে, আজকের দিনে মানুষ সাধারণতঃ নিজের উপর নিজে ভরসা করতে পারে না। অপর কথায় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ অপরকে বিশ্বাস করতে পারেনা, অন্যের উপর ভরসা ও করতে পারে না। এমন কি আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ বড়ও হতে পারে না। কারণ ভরসা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, আর বিশ্বাস নির্ভর করে পরিচয়ের উপর। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যেমন- আপনার বাজার

৩৮

আল্লাহ নিজেই বলেন- ওআইন তা'উদ্দ নি'মাতালাহি লা তুহুহা

"যদি তোমরা গণনা শুরু কর আল্লাহর নি'অমাতের, তা শেষ করতে পারবে না।"

আল্লাহর নি'মাত, দান যেমন গুণে শেষ করা যাবে না, তেমনি সমস্ত নি'অমাতের কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, একটি সাধারণ নি'অমাতের শুকুরগুয়ারীও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তা'হলে আল্লাহর এত দানের শুকুরগুয়ারী মানুষের দ্বারা কি করে সম্ভব? আর তার কি উপায় বা পস্থা মানুষের কাছে আছে? তা'হলে যে আল্লাহর কাছে অকৃতজ্ঞ বা নাফরমান হয়ে থাকতে হবে। না, সে ভয় নেই। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই শুকুরগুয়ারীর উপায় উদ্ভাবন তার দ্বারা সম্ভব নয় বলেই ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ নিজেই হাদীসে কুদসীতে বলেনঃ-

ইয়া যাকারতানী শাকারতানী ওআ ইয়া নাসীতানী কাফারতানী

তুমি যখন আমার যিক্র কর-আমার শুকুরগুয়ারী কর, আর যখন ভুলে থাক-নাফরমানী কর।

কৃতজ্ঞ থাকলে দাতা খুশী হন, বেশী খেয়াল রাখেন। কৃতঘ্ন বা নাফরমান হ'লে দাতা হন নারায়, তাই একের পর এক জারী হলো আল্লাহর শাসন-

ফাযুকুরনী আযুকুরকুম ওআশুকুরনী ওআ লা তাকফুরন

তোমরা আমার যিক্র বা স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার নিমকহালালী করো, নিমকহারামী করোনা।

যেহেতু আল্লাহ খুশী থাকেন, বেশী খেয়াল রাখেন শাকের বান্দার প্রতি, তাই তাকে সব দিকে বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে, কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে নিমকহারামীর জন্য। আল্লাহ বলেনঃ-

লাইন শাকারতুম লা'আযীদান্নাকুম ওআলাইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ অবশ্য যদি তোমরা নিমকহালালী কর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেবো, আর অবশ্য যদি নিমকহারামী করো, নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

৩৭

থেকে সওদা আনার প্রয়োজন; কিন্তু লোক পাচ্ছেন না বাজারে পাঠাবার; তাই বলে কি বাজারগামী যে কোন পথচারীকে, আপনি আপনার বাজারের ফর্দ আর টাকা দিয়ে দেবেন? অগত্যা যদি দিয়েই দেন তা হলে লোকটা অদৃশ্য হওয়ার পর আপনার মনের অবস্থা কি হতে পারে? স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মধ্যে চিন্তা জাগবে, এ কি করলাম? শেষ পর্যন্ত যদি সওদার বদলে লোকটা গায়েব হয়ে যায়? আর যদি নেহাত ভাল লোক হয় তা হ'লে বাজার ঠিকই আনবে, এ কথা ভেবে যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেলো। পরক্ষণেই আবার ভাবিয়ে তুললো আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন। ভাবছেন- আচ্ছা লোকটাতো দেখতে ভদ্র লোকই মনে হলো তবে শাক আনতে যদি কাঁচামরিচ না আনে, মাছের সাথে তরকারীটা যদি মিলিয়ে আনতে না পারে তাহলে খাওয়ার আনন্দটা তো মাঠে মায়া যাবে। তখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, নিজে গেলেই ভাল করতাম কিন্তু এখন করারওতো কিছু নেই। তাই দৃষ্টিভ্রম মরছেন আর পথের ধারে অপেক্ষায় পায়চারী করছেন। দেখছেন-কত লোক বাজার করে বাড়ী ফিরছে, এমনিতে দেখা দিল আপনার সে দৃষ্টিভ্রম কারণ লোকটি। থলে খুলে সওদা দেখে ভাবনার নিরসন ঘটাতে যাচ্ছেন তক্ষণি মাছের দাম শুনে আক্কেল গুড়ুম, তার সাওদায় একবার চোখ বুলিয়ে ভাবছেন দামের অংক ঠিকই তবে উভয় থলে এক করলে।

এখন কথা হলো আপনার প্রশ্নগুলো আর চিন্তার বিষয়বস্তু শুনে সকলেই আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে যে, আপনি লোকটাকে কেন অবিশ্বাস করলেন? লোকটি যে ভাল বা সং না, তা'না জেনে কি করে বলতে পারেন? নিশ্চয়ই এর কোন সদুত্তর আপনার কাছে নেই, কোন যুক্তিও দেখাতে পারবেন না। পক্ষান্তরে আপনি যে নিজের উপরেই আস্থা রাখতে পারছেন না তা সহজেই বুঝা যায়। আপনার যেমন নিজের উপর বিশ্বাস নেই, তেমন নেই অন্যের উপর। যদি বিশ্বাস থাকতো, তাহ'লে নিশ্চিন্তে ভরসা করতে পারতেন, আর বেঁচে যেতেন সমস্ত

৩৯

দুষ্টিতা থেকে। ভালো লোককে মন্দ ভাবতে হতো না, বিশ্বাসী লোককে আপনি পারতেন না অবিশ্বাস করতে, সন্দেহ করে গুনাহর বোঝা বাড়াতে।

এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর উপরও ভরসা করতে পারেনা, তার আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস নেই বলে। মু'মিন বান্দার আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকার কথা। যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস, তিনি হলেন ধন-মাল, হায়াত-মোউত, জীবন-মরণ, সমস্ত রিকের মালিক। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান জগতের সব কিছুই মালিক। এ বিশ্বাস সত্যিকার ভাবে মানুষের মধ্যে তখনই থাকে, যখন সত্যিকার ভাবে তার পরিচয় পায়। অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহই একমাত্র গনী-ধনী, বাকি সকলেই ফকীর-খালীহাত, মুহতাজ-পরমুখাপেক্ষী। আল্লাহর নি'অমাতের ভাগর অফুরন্ত।

সঠিক পরিচয়েই মিলে সে বিশ্বাস, আর এ বিশ্বাসে হয় পরিণয়ের সূত্রপাত। নিখুঁত হ'লে হবে মুহাব্বাত বা ভালোবাসা। তখন বান্দা ন্যস্ত করে সঁপে দেয় নিজেকে তার আল্লাহর কাছে। নিজের সমস্ত দায়িত্বই ন্যস্ত করে দিয়েছে, আর কোন চিন্তারই তার প্রয়োজন পরেনা, কারণ আল্লাহ তার যিম্মাদার হয়ে যান।

আল্লাহ বলেনঃ- ওআ 'আল্লাহি ফাল ইয়াতাওআক্বালি মু'মিনুন

আল্লাহরই উপর ভরসা করা চাই মু'মিনদের। আল্লাহর উপর ভরসা করেনা, এর অর্থ হ'লো দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে না, বরং নিজের উপরই রাখে। আল্লাহর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত না করলে সে বান্দার কাজের জন্য সাধারণ কথায় আল্লাহর পরওয়া করার কিছুই নেই, আর নেই মাথা ঘামাবার মত কিছু। দুনিয়ার রীতি অনুসারেও ন্যস্ত করলে ব্যস্ত হয়, আল্লাহর উপর ভরসা করলে সমাধানের ভার অর্পিত হয় আল্লাহরই উপর। আল্লাহর উপর তাওআক্বাল করলে- ভরসা করলে, যেহেতু সে বিষয়ে আর চিন্তার প্রশ্ন উঠেনা, সে বিষয় নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ উপরোক্ত ঘোষণা দিয়েছেন।

উপরের কথা থেকে এ বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মবিশ্বাস থাকলে অন্যকে বিশ্বাস করা সহজ, বিশ্বাস থাকলে ভরসা করা যায়। যদি বিশ্বাসের সাথে

সুধরিয়ে নিতে পারলেই সম্ভব হবে তাওআক্বাল করা। তাওআক্বাল অর্থ ভরসা, নির্ভর ও সমর্পণ করা বুঝায়। তাওআক্বালের স্তর দু'টি। সাধারণ মু'মিনকে যাহিরী উপকরণ- আস্বাবের মধ্য দিয়ে কর্তব্য পালনের পর কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য করতে হবে আল্লাহর উপর ভরসা। যেমন আলমারীতে চুরি না হওয়ার জন্য তালাচাবি লাগিয়ে, গরু হারানোর ভয়ে রশি দিয়ে বেঁধে, রিক তলাশ করার মাধ্যমে তা মিলার জন্য করবে আল্লাহর উপর তাওআক্বাল। আর আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ যারা আল্লাহর জন্য দুনিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তারা আল্লাহরই সত্ত্বির উদ্দেশ্যে সব কাজ করে থাকেন। তাঁদের তাওআক্বাল হচ্ছে প্রত্যেক কাজের ভালমন্দ চিন্তা না করে আশা আকাংখা বা মাকসুদকে আল্লাহর যিম্মায় সঁপে দেয়া। তাঁদের উকিল একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে উকিল ধরেন, উকিল হিসাবে আল্লাহ তাঁদের জন্য যথেষ্ট।

নাফস অর্থ আত্ম, নিজ, self ego প্রবৃত্ত ইত্যাদি। নাফসের ঘাট নাভিমূলে। উজ্জল তারার রং।

নাফসের সাধারণত চারটি স্তর আছেঃ- (১) বাহীমা, (২) আত্মারা,

(৩) লাউওআমা এবং (৪) মুতুমা'ইনা।

(১) নাফসে বাহীমাঃ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের নাফস। শিশুর আত্মা ও এই নামে অভিহিত।

(২) নাফসে আত্মারাঃ দুষ্টি আত্মা, অব্যাহতার নির্দেশকারী, কঠোর আদেশ কারিনী আত্মা। বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার পর মানুষের লাভ হয় এই নাফস। ইহা আভ্যন্তরীণ দুষমন। মানুষকে ধারণা কাজ করার ব্যাপারে কঠোর আদেশ কারিনী। ঘাঁটিতে থেকে সে করতে থাকে মানুষের সঙ্গে ফেরেবী দুষমনী। ধোকায়ে ফেলে সে করতে থাকে তার ঘরা গুনাহ অন্যায়, অপরাধ, নানা প্রকার গর্হিত কাজ, অপর কথায়, তখন মানুষ হয় নাফসের গোলাম বা কুপ্রবৃত্তির বশ। তখন তার আত্মা হয় দুরাত্মা, দুষ্টাত্মা, পাণীষ্ট, বদকার।

ভালোবাসা থাকে সেখানেই পাওয়া যায় নিশ্চিত ভরসা। কিন্তু কথা হ'লো মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাব কেন? কেনই বা ভরসা করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর উপর ভরসা করলে যেখানে অনেক ঝামেলা চুকে যায়, এ সব জানার পরেও কেন মানুষ তা করতে পারে না, মানুষের এ দুর্বলতা কোথায়?

মানুষ জীবনযাত্রার পথে চলতে চলতে দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কি হতাশার ক্রান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, অনেক সময় তার যাত্রা থেমে যায়। এর কারণ কি? প্রটাই ভালো জানেন, কা'কে কি ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসুল 'আলামীন বলেনঃ- খুলিকাল ইনসানু দ্বায়ীফা

সৃষ্টি হয়েছে মানুষ দুর্বলতায়। যেহেতু মানুষ জানেই দুর্বল, তাই খুঁজে পেতে হয় তাকে কোন আশ্রয়, কাউকে করে নিতে হয় সহায়-সাথী, খুঁজতে হয় এক ভরসার স্থল। যার সাথে সম্পর্ক রেখে হবে সে শক্তিশালী, তখন সে নিজেই খুঁজে পাবে মনোবল, জাগবে আত্মবিশ্বাস, বিশ্বাস করতে পারবে মানুষকে। ভরসা পাবে যেমন মনে, তেমনি ভাবে নিশ্চিত হবে আল্লাহর উপর তাওআক্বাল করে। আর তখন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। তাই একধার স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ নিজেই বলেনঃ-

ওআ মা'ই ইয়াতাওআক্বাল 'আল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহ

আর যে আল্লাহর উপর তাওআক্বাল বা ভরসা রাখে, তিনি যথেষ্ট তার জন্য।

কিন্তু শায়তান যে, মানুষকে আরো দুর্বল করে ছাড়বে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে মানুষ সবল হবে, তা সে হতে দেবে না। আল্লাহকে পুরাপুরি বিশ্বাস করে তাঁর উপর ভরসা রেখে যাতে মানুষ নিশ্চিত না হতে পারে, যাতে আল্লাহর রাজত্ব স্থাপন না করতে পারে, সে প্রচেষ্টাই শায়তানের। তাই প্রবৃত্তিকে নিজের বশে রাখার জন্য দখল করে বসে নাফসকে।

এখন কথা দাঁড়ায়, আমি কি করে আল্লাহর রাজত্ব কায়ম করতে পারবো, তাঁর উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করতে পারবো, তার উপায় খুঁজে বের করা। আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞগণ বলেন- লাত্বীফা সমূহের মধ্যে নাফস লাত্বীফাকে

(৩) নাফসে লাউওআমাঃ- কঠোর মালামত কারিনী আত্মা, তিরস্কার কারিনী আত্মা। এ আত্মা হাঙ্গিলের উপর নির্ভর করে, শায়তানের গোলামীর থেকে আযাদী। আত্মারার ঘাটির উপর আল্লাহ আল্লাহ যিকরের বোমা যাকির-মুজাহিদ কর্তৃক ক্রমাগত নিফেপের ফলে অনন্যোপায় হয়ে সে হার মানে-ঈমান গ্রহণ করে। বদ খেয়াল, বদ স্বাখলাত, বদ কাজ ছেড়ে দিয়ে লক্বু ধারণ করে লাউওআমা। তারপরও মাঝে মাঝে গুণাহে কবীরা করে বসে। আবার অনুতাপ আসে। সে নিজেকে দ্বিধার দিয়ে তাওবা করে, গুনাহে কবীরা হতে বিরত থাকে, আর মশগুল হয়ে পড়ে আল্লাহর যিকরে।

(৪) নাফসে মুতুমা'ইনা-নিশ্চিন্ত শান্তিময়ী একাত্মা। নাফসের এ অবস্থায় হয় আযাদীর পূর্ণতা। এখন সে পুরাপুরি মুসলিম-আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারিনী। মুকাররবা-আল্লাহর নৈকট্য লাভকারিনী। মাহবুবা-আল্লাহর প্রিয়পাত্রী। গুনাহে কবীরা তো সে করেই না, স্বগীরাই কদাচিৎ। সে এখন নিশ্চিন্তে ভরসা করতে পারে আল্লাহর উপর, এবার নাফস খেতাব পায় নাফসে মুতুমা'ইনা।

নাফসে মুতুমা'ইনা হাঙ্গিল করতে হ'লে নিয়মানুযায়ী লাত্বীফা-এ-নাফস কে যিকর শিখাতে হবে, তারপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজ করতে হবে- 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকরের ফায়েয পুরাপুরিভাবে আমার নাফসে আসুক, শায়তানের ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যাক, অন্ধকারের সমস্ত পর্দা উঠে যাক, লাত্বীফা'র রং যাহির হয়ে যাক, আল্লাহ আল্লাহ যিকর জারী হয়ে যাক, আমার নাফসে আল্লাহর রাজত্ব কায়ম হয়ে যাক, তাওআক্বালের ফায়েযের সাথে ফায়েয আসুক, আমার নাফস আল্লাহর উপর পুরাপুরি ভরসাকারী হয়ে যাক, আমার নাফস নাফসে মুতুমা'ইনা হয়ে যাক।

নিয়াতঃ- আমি আমার নাফসের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার নাফস পীর সাহেব দ্বিবলার নাফসের ওআসীলায় আল্লাহতা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ

আছে। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকর ও তাওআক্বুলের ফায়েয আমার নাফসে আসুক। আমার নাফস যিকর করুক আল্লাহ আল্লাহ।

নাফী ও ইস্বাত

আল্লাহ রাব্বুল'আলামীন তাঁর তাওহীদ বা একত্ব প্রচারের জন্য বান্দাদের কাছে পাঠালেন কত দূত, নবী ও রাসূল। আল্লাহ যেমন একমাত্র খালিক, সৃষ্টিকর্তা তেমনি তিনি একমাত্র রাব্ব প্রতিপালক। মানুষের দেহের, মনের, পরিবেশের ব্যক্তিগত ও সমাজগত ভাবে যত কিছু প্রয়োজন সব কিছুই আল্লাহর দেয়া, আল্লাহর করা। আমিও আল্লাহর, এক কথায় সব কিছুই আল্লাহর। আমিও আল্লাহর সৃষ্ট গোলাম। যিনি আমাকে এতসব দিলেন, তাঁর প্রতি আমার কি কর্তব্য? তা-ই বান্দাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আল্লাহর মহত্ত্ব, শক্তি, দয়া, ক্ষমতা, ন্যায়পরায়নতা, ভালবাসা এমনি করে যত গুণ বা নিদর্শন আছে, এক কথায় যাকে আল্লাহর কালিমা বলে, তার বিশ্লেষণ লিখে শেষ করা বা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানুষ দ্বারা তা না হওয়ারই কথা। আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

লাও কানাল বাহরু মিদাদাল লিকালিমাতি রাব্বী লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আনু তানুফাদা কালিমাতি রাব্বী ওআলাও জি'না বিমিসলিহী মাদাদা।

যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের কালিমাতে বর্ণনায় কালি হয়ে যায়, অবশ্যই তা ফুরিয়ে যাবে, আমার প্রতিপালকের কালিমাতে শেষ হওয়ার আগে এবং তেমন যদি আরও আনা হয়, তা-ও। উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে আল্লাহর কালিমাতে অসংখ্য অসীম। সীমিত জ্ঞানে অসীমের হিসাব করা সম্ভব নয়, তাই অসীমের অধিকারী আল্লাহর তরফ থেকে এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন যা সমষ্টিগত ভাবে পূর্ণতার বিকাশ সাধন করে। সে মহাবাহী হলো- কালিমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-নাই কোন 'ইলাহ' আল্লাহ ছাড়া। এমন এক কালিমা যার আওতায় সৃষ্টির সবকিছু। যা মনে প্রাণে, চিন্তায়, কাজে প্রকাশ করলে হয়- আল্লাহ

বান্দার কাছে কি চান তার জবাব। সব কিছুতে এককভাবে আল্লাহকে স্বীকার করার নামান্তর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তাই এ কালিমা হলো সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবার সব কিছুর মুক্তির মূলমন্ত্র। আর এ মূলমন্ত্র কালিমা নিয়েই এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই একলাখ বা দু'লাখ নাবী রাসূল 'আলাইহিমুস সালামের আগমন।

এ কালিমার ব্যাখ্যা ব্যাপক, মানুষের দ্বারা এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর এক অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নেই। শুধু এ ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে কারণ, 'লা-মা'বুদা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এই নিয়মের যত কালিমা আছে যেমন- লা-মাক্দুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই), লা মাতুলুব ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া পাওয়ার, তুলব করার, খুঁজে বেড়াবার মত কেহ নেই), লা-মাহবুব ইল্লাল্লাহ (ভালবাসার পাত্র আল্লাহ ছাড়া কেহ নেই), লা-মাউজুদ ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই), লা-ফাইলা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন কর্তা নেই), লা-রায়িকা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন রিয়ক-দাতা নেই) ইত্যাদি সবগুলো কথা একত্রে এক কথায় বুঝাতে ব্যবহার হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ কালিমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তাৎপর্য যদি আল্লাহর বান্দা বুঝতে পারে, তা হলেই সে সব কিছুকে বিমুখ করে আল্লাহর দিকে রোখ করতে পারে, আল্লাহর সাথে মুহাব্বাত, সম্পর্ক হয় খালেস। সে হতে পারে আল্লাহর খালেস বান্দা।

এ কালিমার যিকরকে বলা হয় নাফী-ইস্বাত যিকর। নাফী ও ইস্বাত-ইনকার ও ইক্কার। আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে মা'বুদ, মাক্দুদ, মাতুলুব, মাহবুব ইত্যাদি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে লা-ইলাহা এবং ইল্লাল্লাহ দ্বারা শুধু আল্লাহকেই স্বীকার করে নেয়া। এই স্বীকৃতি আর অস্বীকৃতি [Negative and Positive] পাশাপাশি চলাতে উভয়ে মিলে, উভয়ের সংযোগ স্থাপনে সৃষ্টি হয় আলো। আর সে আলোতেই ধরা পড়ে সত্য-মিথ্যা, ঋঁটি-অঋঁটি, ভাল-মন্দ। তখনই সম্ভব হয়, অসত্য ছেড়ে সত্যকে আকড়ে ধরা, ভেজাল ফেলে ঋঁটিটা হাত পেতে নেয়া, মন্দকে পরিহার করে ভালটা গ্রহণ করা। তাই জ্বালাতে হবে সে

আলো, নইলে সে অন্ধকার পথ যেমন বিভিষিকায় তেমন দুর্গম।

কতটুকু সুদূর প্রসারী হতে হবে এ আলো, সে বিষয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা। সৃষ্টির নিম্নতম স্তর বা তাহতাস-সারা যে এর নিম্নসীমা, তাতে সকলেই একমত। উপরের সীমা পূর্বাপর বিজ্ঞানীদের মতে 'আরশে মু'আল্লা বা বস্তুর জগতের উর্দ্ধতম স্তর। কিন্তু ইমামুত ত্বারীকুত শায়খ সাযিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রাঃ)-এর মতে, সে স্তরের উর্দ্ধে অর্থাৎ 'আরশে মু'আল্লার উপরিস্থিত 'আলমে আমরের শেষ সীমা 'লা-মাক্বাম' পর্যন্ত সে আলো বিস্তৃত থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি এখানে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম স্তরকে নাফী ইস্বাত স্বোগারার সীমায় রেখেছেন আর 'লা মাক্বাম' পর্যন্ত দেখিয়েছেন নাফী ইস্বাত কোব্রার সীমারেখা।

কক্ষপথের ন্যায় যে পথ দিয়ে আলোটা চলবে, তার কোথায় কোন অবস্থানে, কি অবস্থা বা রূপ নেবে সে বিষয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছেন মারিফাত বিজ্ঞানী ইমামুত ত্বারীকুত শায়খ সাযিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রাঃ)। লাত্বীফা-এ-নাফসকে ধরা হয় আভান্তরীণ জগতের নিম্নসীমা বা তাহতাস-সারা, আখ্ফা 'আরশে মু'আল্লাহ বা বস্তুর জগতের উর্দ্ধসীমা, তার উপর আছে 'আলমে আমরের শেষ সীমা আর ক্বালব হল কুরসী!

ছ'টি স্থিতিশীল নির্দিষ্ট আলোককে কেন্দ্র করেই নাফী ইস্বাতের কক্ষপথ, তাতেই চলতে থাকবে নাফী ইস্বাতের আলো। যাত্রা শুরু হয় নাজী মূলে উজ্জল তারার রং লাত্বীফা-এ নাফস থেকে নিগেটিভ 'লা' শব্দ দিয়ে। লাত্বীফা-এ রাহ হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ স্থাপনকারী কেন্দ্র। 'লা' দিয়ে কি বাতিল বা কর্তন করবে তা প্রকাশ করা দরকার। তাই সংযোগ কেন্দ্রে 'লা' যেয়ে সেখানে লাল রং এর আলোকে তার বিষয়বস্তু ঠিক করে 'ইলাহাকে' নিয়ে ছুটতে থাকে তার উদ্দেশ্য পথে। প্রথমতঃ স্বোগ্রা বা ছোট পরিধীতে 'আরশ পর্যন্ত আর নাফী ইস্বাত কোব্রা বা বিশাল পরিধীতে আরশেরও উপরে 'আলমে আমর, তার উপরিস্থিত শেষ সীমা 'লা মাক্বাম' পর্যন্ত। এবার পজেটিভের তার লেগে যাবে 'ইল্লা' বলে উপর থেকে নিম্ন সীমা পর্যন্ত খেয়াল করার সাথে সাথে, আর স্বোগারায়

সির লাত্বীফা পর্যন্ত খেয়ালে। পথে অতিক্রম করবে বস্তুর জগতের সীমায় এসে সবুজ, কালো, সাদা রংয়ের তিনটি আলোককে। শেষ সীমা থেকে ক্বালবে 'আল্লাহ' টানবে ইলাহ বলতে একমাত্র আল্লাহকে।

এমনিভাবে চলতে থাকবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকর। ফিকর করতে হবে আর ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে যখন যে পরিধিতে হোক। ছোট পরিধিতে খেয়াল করতে হবে নিম্ন-সীমা থেকে 'আরশ পর্যন্ত বা বিশাল পরিধীতে লা-মাক্বাম পর্যন্ত যত কিছু ইলাহাল 'আলামীন আল্লাহর জায়গা দখল করে আছে, সব কিছু 'লা' এর তরবারীর আঘাতে কেটে খান খান হয়ে যাক, গায়কল্পার ঘাটগুলো ধ্বংস হয়ে যাক, আল্লাহকে প্রতিষ্ঠা করার পথে যত বাধা আছে সব দূর হয়ে যাক, সাফ পরিষ্কার হয়ে যাক, ছ'টি লাত্বীফার উপর দিয়ে নূরের রাস্তা তৈরী হয়ে যাক, আলোর পরিধি বেড়ে যাক, আমার আভান্তরীণ জগতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম হয়ে যাক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যিকর করতে হবে- আমি মহান আল্লাহর 'আবদ' বা গোলাম, তিনি আমার মা'বুদ। এখন থেকে আমি নাফসের বা অন্য কারো গোলামী করবো না, গোলামী একমাত্র আল্লাহরই করবো। তাই আকাশে বাতাসে মুখরিত হোক- আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই- লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ। কিছুক্ষণ এভাবে যিকর ফিকর করে খেয়াল করতে হবে- বান্দার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। তাই আমি বলি 'লা-মাক্দুদা ইল্লাল্লাহ'। কিছুক্ষণ এভাবে যিকর ফিকর করার পর খেয়াল করতে হবে আল্লাহই যখন আমার একমাত্র মাক্দুদ তখন আমার তুলবের বস্তুর বা চাওয়া পাওয়ার ধন মাতুলুব, একমাত্র আল্লাহ। তাই আমি বলি 'লা-মাতুলুব ইল্লাল্লাহ'। কিছুক্ষণ যিকর করে ফিকর করতে হবে- কেন আল্লাহ আমার মাতুলুব? কেনই বা আল্লাহকে খুঁজে বেড়াই? এজন্য যে, তিনি তো আমার মাহবুব- ভালোবাসার ধন, তাই আমি বলি 'লা-মাহবুব ইল্লাল্লাহ'-আল্লাহই আমার একমাত্র মাহবুব। আবার কিছুক্ষণ যিকর করার পর ফিকর করতে হবে একমাত্র আল্লাহই মাওজুদ, আল্লাহরই অস্তিত্ব খুঁজে পাই, আর সব কিছুই তো লয়প্রাপ্ত, তাই বলি 'লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ'। কিছুক্ষণ

যিক্র করার পর ফিক্র করতে হবে-আল্লাহ্ আমার উপাস্য মুনীব-মা'বুদ, আল্লাহই আমার উদ্দেশ্য-মাক্‌বুদ, আল্লাহই আমার মাতৃগৃহ, আমার মাহবুব একমাত্র আল্লাহই, মাওজুদ বলতে একমাত্র আল্লাহই আছে, তাই ইলাহা দ্বারা সব কথাগুলো একত্রে বুঝাতে চাই আর ঘোষণা করি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

নিয়াতঃ-

নাফী ইস্‌বাত সোপরা ৪- আমি আমার ছয় লাত্বীফার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার ছয় লাত্বীফা পীর সাহেব ক্বিবলার ছয় লাত্বীফার ওআসীলায় আল্লাহ্ তা'আলার আরশের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আরশে মু'আল্লা হইতে নাফী ইস্‌বাত সোপরার ফায়েয আমার ছয় লাত্বীফায় আসুক।

নাফী ইস্‌বাত কোবরা ৪- আমি আমার ছয় লাত্বীফার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার ছয় লাত্বীফা পীর সাহেব ক্বিবলার ছয় লাত্বীফার ওআসীলায় 'আলমে আমার যাহা লা-মাক্বাম লা-যামান হইতেছে উহার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। 'আলমে আমার হইতে নাফী ইস্‌বাত কোবরার ফায়েয আমার ছয় পাঁচ লাত্বীফায় আসুক।

লাত্বীফা-এ-আব

তৃপ্তিতেই শান্তি আর অতৃপ্তিই জ্বালা বা অশান্তি। তৃপ্তির মাপকাঠি যেহেতু এক নয় সেহেতু বলা যেতে পারে-একটা বিশেষ অবস্থাতে যেমন একটি লোক তৃপ্তি পায়, ঠিক সেই অবস্থাতে আরেকটি লোক খুঁজে পায়না শান্তি। এ কথায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তৃপ্তি ছাড়া যেমন শান্তি পাওয়া যায় না, তেমনি তৃপ্তি তৃপ্তির উপর নির্ভরশীল। আর অল্পতে তৃপ্ত হওয়াই সত্যিকার তৃপ্তি, যাকে 'আরবীতে বলা হয় কানা'আত-Contentment.

৪৮

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

বা-আব, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে যার নাম লাত্বীফা-এ-আব। এরই মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে বুঝা যাবে যে, দেহের সমস্ত তরল অংশের প্রতিটি কণা যেন দূষিত পরিবেশে জমাট বেঁধে শেওলায় আবৃত, পঁচা গলা ময়লার মত যেন এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। কতকাল এ কণাগুলো আলোর মুখ দেখেনি তা কে জানে? এর পরিচর্যার কথা যেন ভাবা যায় না যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব। এমতাবস্থায় যদি বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগে যত্নবান হওয়া যায় এবং এ পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে উঠা যায় তা হলে এ হবে মুক্ত। আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞরা প্রত্যক্ষ অনুধাবন করে বলেন যে, যেহেতু এর ও বলার ক্ষমতা আছে, তাই তাকে দিয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্র বলাতে হবে। তা হলেই করা সম্ভব তার অবস্থার পরিবর্তন। যখন আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্রের ডেউ খেলে যাবে সমস্ত বিন্দুতে, একসাথে তরঙ্গায়িত হবে প্রতিটি কণায় আলোক রশ্মি, তখনই দেখা দেবে আমূল পরিবর্তন।

চক্ষু বন্ধ করে বাতেনী এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে সারাটা শরীরের তরল প্রতিটি কণার প্রতি। যিক্রের নিয়মানুসারে লাত্বীফা দ্বারা যিক্র করার পর শুরু করতে হবে ফিক্র। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে-

আমার আবেব জড়তা দূর হয়ে যাক। যত খারাবী আছে পরিষ্কার হয়ে যাক, আবেব মুখ খুলে যাক। বাইরের পানি যেমন আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্র করছে, তেমনি ভাবে আমার ভিতরের সমস্ত পানি এক সূরে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্র করুক। আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্রের ডেউ খেলে যাক। যিক্র করতে করতে পুরাপুরি কানা'আত আমার মধ্যে এসে যাক। দুশ্চিন্তা আর হা-হতাশ দূর হয়ে যাক। অল্পতে তৃপ্ত হওয়ার অবস্থা আমার মধ্যে এসে যাক। আমি তৃপ্ত শান্ত হয়ে যাই।

নিয়াত : আমি আমার আবেব দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার আব পীর সাহেব ক্বিবলার আবেব ওআসীলায় আল্লাহ্ তা'আলার দিকে

৫০

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবতঃ অল্পতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই তার সময় চলে যায় যোগ বিয়োগে-ওটা হলো না, এটা পেলাম না ওটা খেলাম না। বিশেষ করে যার অভাব নেই, তারই মধ্যে তা আরো বেশী দেখা দেয়। এ যেন মোহের আরেক রূপ। কবির কথায় তাই ধ্বনিত হয় :-

এ জগতে হায়

সেই বেশী চায়

আছে যার ভুরি ভুরি।

এ ভূরুর চাহিদা মেটাতেই দেখা দেয় যত সব খারাবী, বামেলা আর কেলঙ্কারী। নিজের পকেটে না কুলোলে কাটতে হয় অন্যের পকেট। সাধের অতীত সাধ, তাই লেগে থাকে মনের হা-হুতাস আর দীর্ঘশ্বাস। স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, এ অশান্তিতে কত দিন আর বাস করা যায়। জীবনটা যেন বিধিয়ে উঠে।

অতৃপ্ত মনের হা-হুতাস কি জীবন ভর থাকবে? সকলেই কি আমার মত অতৃপ্ত, অসুখী? এমন লোকতো বহু আছে, যাদের আমার যা আছে তা ও-নেই, তা'হলে তারা কি তাতে সন্তুষ্ট? যদি একজন ও সন্তুষ্ট থাকে তা হলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে তৃপ্তির সম্ভাবনা আছে, তৃপ্ত হওয়া অসাধ্য নয়। এক কথায় বলা যায় তৃপ্ত করা যায় না, তৃপ্ত হতে হয়। প্রশ্ন হলো, তৃপ্ত আমার কি জোর করে হবে? হ্যাঁ, সে ক্ষেত্রেও বলা যায়, জোর করে কাউকে তৃপ্ত করা যায় না, তবে ইচ্ছে করলে হওয়া যায়। তা হলে কি ভাবে ইচ্ছে করে হওয়া যায়? ইচ্ছে বা জোর তো মনের উপর সব সময় কয়েই থাকি। তা ছাড়া দিন কালের যে অবস্থা, জোর করে মনকে প্রবোধ দেয়া ছাড়া আর কিই বা করার আছে?

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এ সমস্যার সমাধানে কি বলে তা ভেবে দেখা যাক। মানুষের দেহ সৃষ্টির মধ্যে যতগুলো উপাদান আছে তার কিছু আছে তরল যেমন রস, রক্ত, যা দেহের সর্বত্র বিরাজমান। তাকেই বলা হয় পানি

৪৯

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্র ও কানা'আতের ফায়েয আমার আব-এ আসুক।

লাত্বীফা-এ-আতশ

কথায় বলে- অহংকারই পতনের মূল। কিন্তু প্রশ্ন হলো অহংকারীই কি নিজের পতন চায়? অহংকারী শুনলে চিৎকার করে বলবে না, না পতন চাই না। তা-হলে তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কি? তার আগে দেখা যাক অহংকারটা কি বা কিসের জন্য। অহংকারটা যে কি তা সঠিক করে বলা মুশকিল, তবে ভাব ভঙ্গিতে ফুটে উঠে মানুষটা দোমাগী কিনা। সাধারণ কথায় একে গরিমাও বলে থাকে। কারণ, অহংকারীর হাম-হাম ভাব থাকে। সে ছাড়া আর কেউ যেন কিছু না, বা কেউ কিছু বুঝে না, তেমন একটা গরিমার ভাব। এ গরিমা পাখিবি বিষয়ে কিসে আনতে পারে? সমাজের লোকদের আচার ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যার টাকা পয়সা আছে সে ব্যক্তি তার আচরণে তেমন একটা ভাব দেখিয়ে থাকে। এক কথায় টাকার গরম। আরও দেখা যায় মানুষের মধ্যে শক্তির গরম, বিদ্যার গরম, জনবলের গরম, গুণের গরম, স্বাস্থ্যের গরম ও রূপের গরম ইত্যাদি।

মানুষের দেহে তাপ অতিমাত্রায় দেখা দিলে হুশ জ্ঞান থাকে না, প্রলাপ বকে। এমতাবস্থায় সাধারণ আচরণ তার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানীদের মতে আতশ বা অগ্নি, আগুন, যা মানুষের গঠন উপাদানে আছে তা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তা হলেই দেখা দেয় গরম ভাব নৈতিক দিক থেকে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দেহের নিয়মতান্ত্রিক দিকে লক্ষ্য করে বলে থাকে অগ্নি-মনসা বা চড়া, আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাপের চড়াভাব অস্থির করে তুলে ডাক্তারকেও।

কিছু সংখ্যক লোক যাদেরকে এক্ষেত্রে ভাগ্যবান বলা যায়, তারা জন্মের পর থেকে এমন একটা পরিবেশ পেয়ে আসছে যার প্রভাব তাদেরকেও সে সব গুণ অর্জনে কিছুটা সাহায্য করে, কিন্তু সেই পরিবেশেও আজ-কাল ব্যতিক্রমের মাত্রা বেড়ে গেছে। তা হলে পরিবেশ-এর জন্য দায়ী, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৫১

সে যাই হোক আমাদের বিষয় হলো নৈতিক ও চারিত্রিক দিক, সে দিকটা নিয়ন্ত্রিত না হলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে, তা চিন্তা করা দরকার। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষের মেজাজে গরম ভাব বা অহংকার থাকলে সে অন্য কারো মতের ধার ধারে না। সমাজে সবার সাথে সজ্ঞাব রাখতে হলে, যে Adjustability থাকা দরকার তা হয়ে উঠে না। সব কিছু মাথা পেতে নিতে পারে না। এমনকি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকান্তকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারে না, আত্মসমর্পণ করতে পারে না তাঁর কাছে। আত্মসমর্পণ করাকেই 'আরবীতে বলা হয় তাসলীম।

সমাজের প্রতিটি স্তরেই যেন এ গরম ভাব। যার আছে তারও, আর যার নাই তারতো আরো বেশী। ভদ্রাচার শিষ্টাচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে এ যেন সভ্যতার এক কালো রূপ। পক্ষান্তরে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অমানুষের আচরণের বাড়াবাড়ি সীমাতিক্রম করে গেছে, ফলে সমাজের প্রায় সকলেই জ্বালায় ভুগছে, গোটা সমাজটাই যেন একটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (active volcano)।

বেশী কথা শুনার মত সময় নেই। সমাধান যত শীঘ্র সম্ভব ততই মঙ্গল, তাই আমাদের আসতে হয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানীদের কাছে, ছুটে যেতে হয় তাঁদের দেয়া সমাধানের দিকে। তাই তাঁদের নির্দেশানুযায়ী আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে আগুন বা আতশ-কে, তা হবে নির্দিষ্ট নিয়মে যিক্র ফিক্র দ্বারা। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে-পুরাপুরিভাবে আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের ফায়ের আমার আতশে আসুক। ভিতরের অন্ধকারের পর্দা পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। আল্লাহ-আল্লাহ যিক্রের আগুন জ্বলে উঠুক। আতশের রিয়া, ফখর, ধন দাউলাতের গরিমা, বিদ্যার গরিমা, বংশের গরিমা, স্বাস্থ্যের গরিমা, রূপের গরিমা সব দূর হয়ে যাক। তাসলীম বা আত্মসমর্পণ করার শক্তি আমার মধ্যে আসুক।

নিয়ত ৪- আমি আমার আতশের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি, আমার আতশ পীর সাহেব কিবলার আতশের ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও তাসলীমের ফায়ের আমার আতশ-এ আসুক। আমার আতশ যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-খাক

অদৃষ্টকে আত্মা করে গালি দিতে পারলেই মনে হয় যেন মনের খেদ মিটে, আর বিফলতার গ্রানি মুছে যায়। এমনতর একটা ভাব সাধারণতঃ মানুষের আচরণে ফুটে উঠে। অদৃষ্টের শ্রদ্ধা না করে বরং একবার কৃতকার্য না হতে পারলে আবার চেষ্টা করা যাক, সফল, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন করতেও পারেন। সফলতা যদি নাও আসে তার জন্য হাফতাশ না করে অদৃষ্ট বা তাক্বদীরের উপর রায়ী থাকাই ভালো। তা না হলে নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা মন্দ বা প্রতিকূল বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা যে ভালো বা অনুকূল নয়, তা কে নিশ্চিত করে বলতে পারে? মানুষ যা চায় তার পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেই চায়। তাই, তা না পেলে হয় অসন্তুষ্ট। কিন্তু সে যে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহই ভালো জানেন কিসে তার মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল। আল্লাহ তার বাদার জন্য যা মঙ্গল তাই করে থাকেন। মানুষের তার নিজের জন্য যে দরদ, তার চেয়ে তার জন্য বেশী দরদ আল্লাহর। তাই মানুষ আপাতঃ ভালো মনে করে যা করতে চায়, তা যদি প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তা হলে আল্লাহ দয়া করে তা হতে দেয়না।

কিন্তু মানুষ এ প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারে না বলেই অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে। সে যদি বুঝতে সক্ষম হতো, তা'হলে সে তাতে সন্তুষ্টই থাকতো।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর সৃষ্টির জন্য কিভাবে মঙ্গল প্রয়োগ করবেন বা কিসে মঙ্গল-অমঙ্গল তার জ্ঞান মানুষের নেই। অতএব আল্লাহর কাজের উপর বা তাক্বদীরের উপর রায়ী থাকতে হবে, আর কিভাবে তা সম্ভব তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন :

রাখিআল্লাহ আনহুম ওআ রাহু আনহু যালিকা লিমান খাশিয়া রাহ্মাহ

-আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এ হলো তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

কথায় বলে, অমুক লোকটি একজন মাটির মানুষ। এ কথা তখনই বলা সম্ভব, যখন একজন লোক কঠিন অবস্থাতেও সত্যিকারের শান্ত থাকে এবং সব অবস্থাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারে। এ নির্দিষ্ট লোকটির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহর ভয় তার মধ্যে যেমনি আছে, তেমনি আল্লাহর জন্য মুহাব্বাতও তার আছে অশেষ। ভয়ের আর একটা রূপ দেখতে পাওয়া যায় হিংস্র পশুর মধ্যেও, যেমন হিংস্র পতকে লাঠি বা কোন অস্ত্র দেখলে সে ভয়ে যেন মাটি হয়ে যায়। মাটি হয়ে যাওয়া এবং মেনে নেয়া এই উভয় ক্ষেত্রেই মিল যেমন আছে, তেমনি তফাৎও আছে-মানুষের ভীতি, ভালবাসা বিজড়িত, পাছে প্রিয়জন অসন্তুষ্ট না হয়ে পড়ে।

কি উপায়ে মানুষ তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট বা রায়ী থাকতে পারে সে বিষয়ে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বলে যে, মাটির উপাদানে সৃষ্ট মানুষকে মাটির মানুষ হতে হবে। তা তখনই সম্ভব হবে, যখন মাটির উপাদানের অণু-পরমাণুগুলো আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করতে শিখবে, আল্লাহর নূরে বরব্বারে হয়ে আল্লাহর মুহাব্বাত অর্জন করবে। তাই নিয়মানুযায়ী খাক বা মাটিকে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ফিক্র শিখাতে হবে। ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে-আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের ফায়ের পুরাপুরি আমার খাকে আসুক। খাকের জড়তা অলসতা দূর হয়ে যাক। যিক্রের নূরে খাকের প্রতিটি যারুয়া ঝরঝরে হয়ে যাক, বাইরের মাটির সাথে এক সুরে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করুক। যিক্র করতে করতে এমন হাল হয়ে যাক, যাতে তাক্বদীরের উপর সব সময় সর্ব অবস্থায় রায়ী থাকতে পারি। মাটি যেমন কোন অবস্থাতেই নারায়ী প্রকাশ করে না, আমিও তেমনি মাটির মানুষ হয়ে যাই। আমি আল্লাহর সবকিছুতেই রায়ী হয়ে যাই, আল্লাহ আমার উপর রায়ী হয়ে যাক।

নিয়ত ৪ আমি আমার খাক-এর দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার খাক পীর সাহেব কিবলার খাক-এর ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও ফিক্র এবং রেদ্বার ফায়ের আমার খাক-এ আসুক। আমার খাক যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-বাদ

বায়ু বা বাতাস প্রকৃতিগতভাবে অধীর, অস্থির, চঞ্চল। চঞ্চলতার বিপরীত গুণ হলো-ধীরতা, স্থিরতা; 'আরবীতে যাকে বলা হয় স্ববর। চঞ্চলতা জীবনে শৃংখলা নষ্ট করে, অস্থিরতা এনে দেয় জীবনে অশান্তি; আর ধীরতা আনে জীবনে শান্তি যা উন্নতির সোপান। ধৈর্যই সব সমস্যার সমাধান করে। কথায় বলে স্ববুরে মেওআ ফলে, ধৈর্য বা স্ববর মানুষের একটা বিশেষ গুণ।

বাতাসের চাপে যেমন ঝড় সৃষ্টি হয়, আর সে ঝড় ময়বুত ঘর-বাড়ী নষ্ট করে দিতে পারে। তেমনি অধৈর্য ক্ষণিকের মধ্যে মানুষের সবগুণ, সকল কীর্তি ধ্বংস করে দিতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে জিনিস অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকলে বা বশে না থাকলে যত বেশী ক্ষতি করে, তার দ্বারা তত বেশী উপকারও সাধন করা যায় নিয়ন্ত্রণে এনে।

ধীরতার অভাবে কত মানুষ জীবনের চলার পথে খেঁচি হারিয়ে ফেলেছে, মাঝ পথে যাত্রা ভঙ্গ করেছে, বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করেছে, তা আমরা চোখ খুললেই দেখতে পাই। আমরা কি তা থেকে আমাদের জীবনের জন্য কিছু গ্রহণ করি? না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তা গ্রহণ করি না।

মানুষকে অবনতি থেকে বাঁচতে হলে, তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তার ভিতরের বাতাস। একে একমাত্র আল্লাহর যিক্র দ্বারাই বশ করা যায়। আমাদের ভিতরের এই বাতাসকে ধূলা আবর্জনা থেকে মুক্ত করে, তাতে আল্লাহর নূরের আলোক রশ্মির প্রবাহ চালাতে হবে, তবেই তা হয়ে উঠবে কলুষমুক্ত, ধীর, স্থির ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

মুখে ধৈর্যের কথা বললেই ধৈর্য ধরা যায় না। ভিতরে এমনি একটা বেপরোয়া ভাব বা শক্তি আনতে হবে, যাতে বিপদকে ভুজ্জ মনে করা যায়। আর বিপদকে শুধু বিপদ না মনে করা হয়, বরং মুহীবাতকে নি'আমাত মনে করাই প্রকৃত স্ববর। আল্লাহ বলেন :

ইন্নাল্লাহা মা'আয-সাবিরীন

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

যিক্র ফিক্র দ্বারা বাতাসের খারাবী দূর করে, তাতে বইয়ে দিতে হবে আলোর প্রবাহ। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে :- আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের ফায়েয পুরাপুরি আমার 'বাদ'-এ পৌছুক। বাদ-এ যত খারাবী আছে সব দূর হয়ে পরিস্কার হয়ে যাক। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র জারী হয়ে যাক। ভিতরের বাতাস বাইরের বাতাসের সাথে এক সূরে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করুক, আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের তুফান বয়ে যাক; স্ববরের ফায়েয আমার বাদ-এ আসুক, আমি স্বাবের বান্দা হয়ে যাই, আল্লাহ আমার সাথী হয়ে যাক।

নিয়াত : আমি আমার বাদ-এর দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার বাদ পীর সাহেব কিবুলার বাদ-এর ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। যাত পাক হতে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও স্ববরের ফায়েয আমার বাদ-এ আসুক। আমার বাদ যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-খালা

মানুষের জাগতিক ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের যত কিছুই একজন লোকের মধ্যে থাকুক না কেন, যদি তার মধ্যে শিষ্টাচার, নম্রতা, তাওআদ্ব'না থাকে তা'হলে সম্মানের পাত্র হতে পারে না। পক্ষান্তরে সে হয় ঘৃণার পাত্র।

একজন কর্মচারী তার অফিসের কাজ যতই সুন্দরভাবে করুক না কেন, সে যদি উর্ধ্বতনের কাছে বিনয়ী না হয়, তার পদোন্নতির আশা হয় সুদূর পরাহত। এ অবস্থা জাগতিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যেমন প্রযোজ্য তেমনি আল্লাহর দরবারেও বিনয়ী না হলে আত্মার উন্নতি সাধন হয়ে উঠে অসম্ভব।

প্রগতির যুগে মানুষ একস্থানে এক অবস্থায় বসে থাকতে চায় না। তাই জড় বা জাগতিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয় অণু-পরমাণুকে নিয়ে। তার মাঝে আবিষ্কার করেছে খালা বা শূন্য। শূন্যেই যেমন অণুপরমাণুর খেলা, তেমনি ভাবে অণুপরমাণুতেই আবার শূন্যের খেলা। শূন্য যেমন একটা আরেকটার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তেমনি প্রত্যেকের নিজ নিজ সত্ত্বাকে

৫৬

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

নিয়ন্ত্রণও করে একটি শূন্য। আর শূন্যেরও অস্তিত্ব আছে আপন সীমায়। আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থূল যা কিছু দেখি যেমন মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি, যেগুলোর প্রত্যেকটি একটা একটা স্বত্বা বলে মনে করি, বস্তুর সেগুলির প্রত্যেকটি অসংখ্য অণু-পরমাণুর সমষ্টি, যার প্রতিটির মাঝে আছে ফাঁক বা শূন্য।

শায়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে মানুষের ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রীয় সমস্ত কিছুতে বিরাজ করার ক্ষমতা চাইলো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাকে সে শক্তি দিয়েও দিলেন। তাই তাকে বাসা বাঁধতে ও প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায় লাত্বীফাগুলোতে। তার বিশেষ লক্ষ্যস্থল অণু-পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকের শূন্যগুলো। সেগুলো দখল করতে পারলে সে প্রভাবান্বিত করতে সফল হয় সমস্ত অণুপরমাণুগুলোকে। যার ফলে মানুষ হয়ে যায় শায়তানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

যে সূক্ষ্ম ঘাঁটি থেকে শায়তানকে উচ্ছেদ করে তার রাজত্বকে ধ্বংস করে আল্লাহর রাজত্ব কায়ম করতে হবে। নির্দিষ্ট নিয়মে যিক্র ফিক্র দ্বারা শূন্য বা ফাঁককে শায়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করার পর তাতে বইয়ে দিতে হবে আল্লাহর নূরের ধারা, যেন নূরের সমুদ্রে ভাসে প্রতিটি অণু-পরমাণু। আর সে নূরে সিক্ত হয়ে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যাবে আমূলভাবে। জানে, গুণে, ভালবাসায় ভরপুর হয়ে তখন সে নিজে থেকেই নূরে পড়বে ফল বোঝাই গাছের মত। আর আল্লাহ কাছে টেনে নেবেন তার বান্দাকে আপন মুহাব্বাতের হেরেমে।

আল্লাহর রাসূল বলেন :

মান্ন তাওআদ্বা'আ লিল্লাহি রাফা'আহল্লাহ

যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উন্নতি দেন।

তাই খালা-লাত্বীফা দ্বারা নিয়মানুসারে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করতে হবে, নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে-আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের পুরোপুরি ফায়েয আমার খালা-তে আসুক। শায়তানের ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যাক, একেবারে খালি হয়ে যাক। যিক্র করতে করতে নূরে ভরপুর হয়ে যাক, আমি বিনয়ী হয়ে যাই। দুনিয়া আখেরাতে আমার পদোন্নতি হয়ে যাক। আল্লাহর আর আমার মধ্যে যে দূরত্ব তা উঠে যাক। আমি আল্লাহর মুহাব্বাতের হেরেমে পৌঁছে যাই।

৫৭

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

যিক্র ফিক্র দ্বারা বাতাসের খারাবী দূর করে, তাতে বইয়ে দিতে হবে আলোর প্রবাহ। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে :- আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের ফায়েয পুরাপুরি আমার 'বাদ'-এ পৌছুক। বাদ-এ যত খারাবী আছে সব দূর হয়ে পরিস্কার হয়ে যাক। আল্লাহ আল্লাহ যিক্র জারী হয়ে যাক। ভিতরের বাতাস বাইরের বাতাসের সাথে এক সূরে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করুক, আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের তুফান বয়ে যাক; স্ববরের ফায়েয আমার বাদ-এ আসুক, আমি স্বাবের বান্দা হয়ে যাই, আল্লাহ আমার সাথী হয়ে যাক।

নিয়াত : আমি আমার বাদ-এর দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার বাদ পীর সাহেব কিবুলার বাদ-এর ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। যাত পাক হতে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র ও স্ববরের ফায়েয আমার বাদ-এ আসুক। আমার বাদ যিক্র করুক আল্লাহ আল্লাহ।

লাত্বীফা-এ-খালা

মানুষের জাগতিক ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের যত কিছুই একজন লোকের মধ্যে থাকুক না কেন, যদি তার মধ্যে শিষ্টাচার, নম্রতা, তাওআদ্ব'না থাকে তা'হলে সম্মানের পাত্র হতে পারে না। পক্ষান্তরে সে হয় ঘৃণার পাত্র।

একজন কর্মচারী তার অফিসের কাজ যতই সুন্দরভাবে করুক না কেন, সে যদি উর্ধ্বতনের কাছে বিনয়ী না হয়, তার পদোন্নতির আশা হয় সুদূর পরাহত। এ অবস্থা জাগতিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যেমন প্রযোজ্য তেমনি আল্লাহর দরবারেও বিনয়ী না হলে আত্মার উন্নতি সাধন হয়ে উঠে অসম্ভব।

প্রগতির যুগে মানুষ একস্থানে এক অবস্থায় বসে থাকতে চায় না। তাই জড় বা জাগতিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয় অণু-পরমাণুকে নিয়ে। তার মাঝে আবিষ্কার করেছে খালা বা শূন্য। শূন্যেই যেমন অণুপরমাণুর খেলা, তেমনি ভাবে অণুপরমাণুতেই আবার শূন্যের খেলা। শূন্য যেমন একটা আরেকটার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তেমনি প্রত্যেকের নিজ নিজ সত্ত্বাকে

৫৬

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

নিয়ন্ত্রণও করে একটি শূন্য। আর শূন্যেরও অস্তিত্ব আছে আপন সীমায়। আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থূল যা কিছু দেখি যেমন মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি, যেগুলোর প্রত্যেকটি একটা একটা স্বত্বা বলে মনে করি, বস্তুর সেগুলির প্রত্যেকটি অসংখ্য অণু-পরমাণুর সমষ্টি, যার প্রতিটির মাঝে আছে ফাঁক বা শূন্য।

শায়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে মানুষের ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রীয় সমস্ত কিছুতে বিরাজ করার ক্ষমতা চাইলো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাকে সে শক্তি দিয়েও দিলেন। তাই তাকে বাসা বাঁধতে ও প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায় লাত্বীফাগুলোতে। তার বিশেষ লক্ষ্যস্থল অণু-পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকের শূন্যগুলো। সেগুলো দখল করতে পারলে সে প্রভাবান্বিত করতে সফল হয় সমস্ত অণুপরমাণুগুলোকে। যার ফলে মানুষ হয়ে যায় শায়তানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

যে সূক্ষ্ম ঘাঁটি থেকে শায়তানকে উচ্ছেদ করে তার রাজত্বকে ধ্বংস করে আল্লাহর রাজত্ব কায়ম করতে হবে। নির্দিষ্ট নিয়মে যিক্র ফিক্র দ্বারা শূন্য বা ফাঁককে শায়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করার পর তাতে বইয়ে দিতে হবে আল্লাহর নূরের ধারা, যেন নূরের সমুদ্রে ভাসে প্রতিটি অণু-পরমাণু। আর সে নূরে সিক্ত হয়ে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যাবে আমূলভাবে। জানে, গুণে, ভালবাসায় ভরপুর হয়ে তখন সে নিজে থেকেই নূরে পড়বে ফল বোঝাই গাছের মত। আর আল্লাহ কাছে টেনে নেবেন তার বান্দাকে আপন মুহাব্বাতের হেরেমে।

আল্লাহর রাসূল বলেন :

মান্ন তাওআদ্বা'আ লিল্লাহি রাফা'আহল্লাহ

যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উন্নতি দেন।

তাই খালা-লাত্বীফা দ্বারা নিয়মানুসারে আল্লাহ আল্লাহ যিক্র করতে হবে, নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করতে হবে-আল্লাহ আল্লাহ যিক্রের পুরোপুরি ফায়েয আমার খালা-তে আসুক। শায়তানের ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যাক, একেবারে খালি হয়ে যাক। যিক্র করতে করতে নূরে ভরপুর হয়ে যাক, আমি বিনয়ী হয়ে যাই। দুনিয়া আখেরাতে আমার পদোন্নতি হয়ে যাক। আল্লাহর আর আমার মধ্যে যে দূরত্ব তা উঠে যাক। আমি আল্লাহর মুহাব্বাতের হেরেমে পৌঁছে যাই।

৫৭

সুলতানুল আযকার

মানুষের শরীরের মধ্যে যে এগারোটি লাত্বীফার সন্ধান পাওয়া গেল, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ অগণিত সত্ত্বার অধিকারী একটি রূপ। এ অগণিত সত্ত্বার ভাল-মন্দ, সুস্থতা-অসুস্থতা, দুর্বলতা-সবলতা, সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, উন্নতি-অবনতি, সব কিছুর দায়িত্ব মানুষের উপর।

এ স্বভাবগত প্রকৃতির প্রতিটি অবস্থার দুটি দিক আছে—দৈহিক আর আত্মিক, যেমন দেহের ভালো বা আত্মার ভালো, দেহের অসুস্থতা বা আত্মার অসুস্থতা, দেহের উন্নতি বা আত্মার উন্নতি।

প্রতিটি লাত্বীফার অনুশীলনে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে লাত্বীফার মধ্যকার দোষ বের করে ফেলা যায়, পরিকার বিশুদ্ধ করা যায়, লাত্বীফা সুস্থ, সবল, সক্রিয়, উন্নত করা যায়, লাত্বীফাকে আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত রাখা যায়। আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর আধিপত্য, আকর্ষণ, মুহাব্বত দূরে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর আকর্ষণ মুহাব্বত, আধিপত্য এক কথায়, আল্লাহর রাজত্ব কায়মে করা যায়।

এতক্ষণ পৃথকভাবে প্রত্যেকটি লাত্বীফায় যিকর ফিকর করা হয়েছে। এখন করতে হবে সবগুলো লাত্বীফা ঘারা এক সাথে। তাই এ যিকরকে বলা হয় যিকরের রাজা-সুলতানুল আযকার। যিকরের আত্মানে এক সাথে জেগে উঠবে প্রতিটি সত্ত্বা আর এক সুরে করতে থাকবে আল্লাহর যিকর। সে যিকরে তুলাধুনা হয়ে প্রবেশ করবে প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নূর। নূরের ফায়েরে তুফান যখন প্রবল আকার ধারণ করবে তখন যিকর করতে করতে হয়ে যাবে তন্ময়, ভাসতে থাকবে নূরের সমুদ্রে—সবদিকে আলো আর আলো। তাই এ যিকর সুলতানুল আযকার নামের সার্থকতা রাখে।

এই যিকরে নিশ্চিত হয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শায়তানের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় মানুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার দ্বার, অর্জিত হয় নাফসকে কাবুতে আনার শক্তি, সম্ভব হয় সংগঠন নাফসকে মুসলমান করা, নাফসে আশ্চার্যকে মুত্তামাইনা করা, নিরাপদ নিশ্চিত করা যায় অহরহ আল্লাহর যিকর ফিকর, রাখা যায় আল্লাহর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক।

সুলতানুল আযকারে সাধিত হয় উন্নতি, আরো উন্নতি, যে স্তরে পৌছলে সালিক করতে পারে ইচ্ছামত দরদ পাঠ, তাসবীহ পাঠ, কালিমা বা কুর'আন পাঠ, এর সন্ধান মেলে ত্বরীক্বা-এ-আহমাদীয়ায়। উন্নতির অর্থশ্রা অনুসারে এই যিকরে আছে দুটি ধাপ বা স্তরঃ (২) সুলতানুল আযকার যোগুরা ও (২) সুলতানুল আযকার কোবরা।

(১) সুলতানুল আযকার যোগুরা

যোগুরা অর্থ ছোট। প্রথম অবস্থায় শুধু আল্লাহ আল্লাহ যিকর। বর্হি-জগতের অগণিত সৃষ্টি যাকে 'আলম বা আল্লাহর কুদরাতের নিদর্শন বলা হয়। যেমন মানুষ একটা 'আলম, গাছ একটা 'আলম, পাখী একটা 'আলম, তেমনিভাবে অগণিত 'আলমের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আর জ্বিন ছাড়া আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, গাছ-পালা, তরলতা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি প্রতিটি অণু-পরমাণু এমনকি খালা-শূন্য বা Vacuum আল্লাহ আল্লাহ যিকর করে। প্রতিটি সৃষ্টিই কতব্য পালনের ভিতর দিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল।

আল্লাহ বলেনঃ

ওআইম মিন শায়ইন ইল্লা ইউসামিহ বিহাম্দিহী ওআলা কিল লাভাফ ক্বাহনা তাসবীহাহম

এবং 'শায়' বলতে যা কিছু আছে শুধু তাঁরই প্রশংসায় তাসবীহ পড়ে অথচ তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না।

এগারো লাত্বীফার যিকর মুরাক্বা বা অধ্যায়ে যা খেয়াল ও আরজু করার নির্দেশ আছে তা করতে হবে। আরো আরজু করতে হবেঃ

সুলতানুল আযকার যোগুরার ফায়েয পুরাপুরিভাবে আসুক। প্রতিটি অণু-পরমাণু জেগে উঠুক। এক সাথে এক সুরে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকুক। আল্লাহ আল্লাহ যিকরে তুলা-ধুনা হয়ে যাক। অজস্র ধারায় নূরের ফায়েয আসুক। তোলপাড় করে ফায়েয আসুক। আল্লাহ আল্লাহ যিকরে, ফায়েরে তুফান বয়ে যাক। আমার আভ্যন্তরীণ জগতে যা কিছু আছে বাহিরের জগতের সব কিছুর সাথে এক সাথে এক সুরে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করুক। নূরের সমুদ্রে ডুবে যাক। ফানা হয়ে যাক।

নিয়াতঃ আমি আমার এগারো লাত্বীফার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। পীর সাহেব ক্বিবলার এগারো লাত্বীফার ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। সুলতানুল আযকার যোগুরা যিকরের ফায়েয, আমার এগারো লাত্বীফায় আসুক। এগারো লাত্বীফা একসুরে যিকর করুক আল্লাহ আল্লাহ।

(২) সুলতানুল আযকার কোবরা

সুলতানুল আযকার যোগুরার যিকর জারী হওয়ার পর শুরু করতে হয় সুলতানুল আযকার কোবরার যিকর। যোগুরা অর্থ ছোট, আর কোবরা অর্থ বড়, অনেক বিষয়ে যা বড়, যোগুরাতে আর কোন যিকর হয় না, যিকর হয় শুধু আল্লাহ আল্লাহ। নামায, কুরআন তিলাওআত, দরদ শরীফ, তাসবীহ বাতেনী সমস্ত মুখ দ্বারা পড়াতে হলে যিকর করতে হয়, সুলতানুল আযকার কোবরা। একবার পড়াতে পাড়লে হয় অসংখ্য অগণিতবার।

শুধু যে জড় জগত বা বস্তু জগত বলতে যা বুঝায়, তার প্রতিটি পদার্থই আল্লাহর যিকরে রত থাকে তা নয়, বরং বস্তু জগতের উর্ধ্ব সীমা 'আরশের উপরিস্থিত 'আলমে আমরা যে কিছু আছে তাও তাসবীহ পড়ে। কে কখন কি তাসবীহ পড়ে তা আল্লাহ ভালো জানেন। এসব কিছুর সাথে অনেক সময় একটা ভাল রেখে যিকর করার আশা করা যায় সুলতানুল আযকার কোবরা জারী হলে।

সুলতানুল আযকার কোবরার শুরুতে লাত্বীফাগুলোকে 'লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ' বলবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। তাহলে পরবর্তীতে অবস্থাতে যিকর মুরাক্বাবার সময় সাথে সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর খেয়ালও আসবে।

সুলতানুল আযকার কোবরায় কোন অস্তিরতা নেই। একেবারে নীরব শান্ত। ফারস, সুন্নাত, নাফল যত 'ইবাদাত আছে প্রত্যেকটাতেই চলতে থাকে প্রতিটি বাতেনী সত্ত্বার 'ইবাদাত। সালিকের এ অবস্থায় 'ইবাদাতের স্বাদই আলাদা। মানুষ যাতে সে স্বাদ পায়, তার সন্ধান দিতেই ত্বরীক্বা-এ আহমাদীয়ায় সুলতানুল আযকার কোবরার প্রবর্তন।

যখন যে 'ইবাদাতের মধ্যে থাকবে, তার পুরাপুরি হাল-হাক্কীক্বাত

কাইফিয়াত যাহির হওয়ার আরজু করতে হবে। তার সাথে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আরজু করবে—আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুই নামায আদায় করুক, দরদ শরীপ পড়ুক, কুর'আন তিলাওআত করুক ইত্যাদি।

নিয়াতঃ আমি আমার এগারো লাত্বীফার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার এগারো লাত্বীফা পীর সাহেব ক্বিবলার এগারো লাত্বীফার ওআসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। সুলতানুল আযকার কোবরার ফায়েয আসুক আমার এগারো লাত্বীফায়, ও তারা এক হয়ে এক সুরে পড়ুক—(যখন যা পড়বার তার উল্লেখ নিয়াতে করতে হবে)।

ফাজর বা 'দ ওআযীফা

১। দরদ শরীফ—১০১ বার

আল্লাহুমা স্বাল্লি ওআসাল্লিম ওআবারিক 'আলা হাবীবিকা সাইয়্যিদিনা আহমাদ, সাইয়্যিদিল কাওনাইন, ওআ 'আলা আলিহী ওআ স্বহবীবহী, ওআ মাও ওআলাহ, ওআ মুহয়ী সুন্নাতিলহী শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন (রাঃ) ওআ মাশাহিবহী ওআ 'ইতরাতিহী ওআ আইমাহিত ত্বরীক্বিত ওআল আউলিয়া ওআস্ব স্বলিহীন ফী কুল্লি লাম্হাতিও ওআ নাফাসিম মিন কুল্লি যাররতিন 'আদাদা 'ইলমিকা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ! স্বলাত-সলাম ও বারাকাতের হাদীয়া পেশ করছি আপনার হাবীব আমাদের আক্বা মাওলা আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহী ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার উপর, যিনি দু'জাহানের বাদশা, আর যারা তাঁকে ভালবাসেন তাদের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বহাবাগণের, আর তাঁরই আদর্শের পুনর্জীবিতকারী শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রাঃ)-এর উপর, সদা সর্বদা, অহরহ প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে, ততো সংখ্যায়, যত সংখ্যা আপনার 'ইলমে আছে।

নিয়াতঃ আমি আমার জিস্ম ও জানের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

জিসম ও জান পীর সাহেব ক্বিবলার জিসম ও জানের ওআসীলায় হাযরাত শায়খ সাযিদ মুহাম্মাদ বোহানুদ্দীন (রাঃ)-এর জিসম ও জান মুবারাকের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। তাওআজ্জিহ মুহাব্বাতও যিয়ারাতের ফায়েয আমার জিসম ও জানে আসুক।

২। লাহাওলা ১০১ বার

(লা-হাওলা-ওআলা আ কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ)

অর্থ :- নাই কোন শক্তি নেক আলম করার, আর নাই কোন ক্ষমতা ওনাহ থেকে বাঁচার আল্লাহর শক্তি ছাড়া।

পড়ার সময় খেয়াল করতে হবে ঃ আমার জিসম ও জানে এই আয়াতে শরীফের ফায়েয আসুক। অর্থের দিকে লক্ষ্য করে পড়তে হবে।

এই আয়াত শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়তে হবে। বেশী পড়তে পারলে ভালো।

৩। সুলতানান্নাযীরা (সাহায্যকারী শক্তি)

চোখ দুটি বন্ধ করে আপদোমস্তক সমস্ত শরীরের অণু-পরমাণুর দিকে খেয়াল করে নিম্নলিখিত দরুদ শরীদ ১০১ বার পড়তে হবে। আরজু করতে হবে ঃ যে সাহায্যকারী শক্তির প্রভাবে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওআলিহী ওয়া সাল্লাম শত বাধা বিঘ্নের ভেতর নাবুওয়াতের কঠিন দায়িত্বভার পালন করতে পেরেছিলেন, তৌহীদের বাণী প্রচার করে দীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন, আমিও সেই শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে যেন সর্বপ্রকার দায়িত্ব পূরাপূরিভাবে পালন করতে পারি ও 'আক্বাদায় আমলে দীন ইসলামের উপর পুরাপুরি কায়ম থাকতে পারি। মাঝে মাঝে সেই সাহায্যকারী শক্তির আরজু করে পড়তে হবে।

ওয়াজ 'আল্লী মিল্লাদুনকা সুলতানান্নাযীরা

অর্থ :- (হে আল্লাহ) আমাকে আপনার পক্ষ হতে সাহায্যকারী শক্তি প্রদান করুন।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

আল্লাহুমা স্বল্লি ওআ সাল্লিম ওআ বারিক 'আলা হাবীবিকা সাযিদিনা আহমাদ সুলতানান্নাযীরা ওআ 'আলিহী ওআ স্বহবিহী ওআ মাও ওআলাহ ফী কুল্লি লামহাতিও ওআ নাফসিম মিন কুল্লি যাররাতিন 'আদাদা ইলমিকা।

নিয়ত ঃ আমি আমার জিসম ও জানের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার জিসম ও জান পীর সাহেব ক্বিবলার জিসম ও জানের ওআসীলায় স্বহবি সুলতানান্নাযীরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআলিহী ওআসাল্লামির যাত মুবারকের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। সুলতানান্নাযীরার ফায়েয আমার জিসম ও জানে যাত আসুক।

'ইশা বা'দ ওআযীফা

১। নাফী ও ইসবাত যিক্র ৫০০ বার (নিয়মাবলী সবকের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

২। দো'আ-এ- ইউনুস ৩১৩ বার।

এমন কোন মানুষ দুনিয়ায় নাই যার মুস্বীবাৎ নাই। যার মনোবাঞ্ছা বা আশা আকাংখা নাই, আর যে রোগ-মুক্তি চায় না। সাংসরিক জীবনে চলার পথে হোক বা আল্লাহকে পাওয়ার পথে হোক, মুস্বীবত মানুষের কম বেশী আছেই। মাক্‌সুদে না পৌছা পর্যন্ত মুস্বীবাতের শেষ নেই। আল্লাহকে পাওয়ার আশায়ই হোক-আর দুনিয়ার ঐশ্বর্য হাফিজ করার উদ্দেশ্যই হোক মানুষের আশা উদ্দেশ্য থাকবেই। দেহের হোক বা আত্মার হোক, যে কোন প্রকার রোগ মানুষের আছেই।

মুস্বীবাত দূর করতে সক্ষম, বরং মুস্বীবাতগুলো নি'আতে বদলে দিতে, আশা পূরণ বা রোগ মুক্ত করতে সক্ষম কে? একমাত্র ইলাহাল 'আলামীন' আল্লাহ। তাই মানুষ যখন মুস্বীবাতের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে, রোগে শোকে জর্জরিত হয়ে পড়ে, বাঁচার কোন ভরসা পায় না, তখন তাকে ধর্মা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয় সর্বশক্তিমানের কাছে, যেমনি ভাবে নিজেই সোপান করে দিয়েছিলেন হাযরাত ইউনুস (আঃ)। নিজেই অসহায় ভেবে, আল্লাহকে একমাত্র সহায় মনে করে, নিজের ওনাহর কারণেই এ মুস্বীবাত এবং তার ক্ষমা পেলেই মুস্বীবাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব খেয়াল করে জিহ্বা, ঠোট নেড়ে চুপি চুপি পড়তে থাকবে ঃ-

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

নিম্ন লিখিত দরুদ শরীফ মুহাব্বাতের সাথে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার যিয়ারাতের আরজু নিয়ে পড়তে হবে কম পক্ষে একশত বার।

যে যাকে মুহাব্বাত করে, তার কথাই স্মরণ করে, তার উন্নতি কামনা করে, তাকে অনুসরণ করে তার নমুনা হতে চায়। যেহেতু আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামাকে সবকিছু এমন কি জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতে না পারলে সত্যিকার মু'মিন হওয়া যায় না। আর তাঁর অনুকরণ না করলে আল্লাহর মুহাব্বাত পাওয়া যায় না। তাই মুহাব্বাত পাবার গুণ অর্জন করতে হলে, তাকে হুকুম অনুসরণ করার শক্তি অর্জন করতে হলে, মুহাব্বাতের সাথে তাকে স্মরণ করে তাঁর উপর দরুদ শরীফ পড়তে হবে।

নিয়াত ঃ- আমি আমার জিসম ও জানের দিকে মুতাওআজ্জিহ আছি। আমার জিসম ও জান পীর সাহেব ক্বিবলার জিসম ও জানের ওআসীলায় যাত মুবারাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার দিকে মুতাওআজ্জিহ আছে। যাত মুবারাক থেকে তাওআজ্জিহ, মুহাব্বাত ও যিয়ারাতের ফায়েয আমার জিসম ও জানে আসুক। তাঁর মুহাব্বাত ও যিয়ারাত আমার নাব্বী হয়ে যাক, ইত্তিবা'য়ী সুলাতের ফায়েয আসুক।

আল্লাহুমা স্বল্লি ওআ সাল্লিম ওআ বারিক 'আলা হাবীবিকা সাযিদিনা আহমাদ নুরিল আনওয়ার ওআ সিররিল আসুরারি ওআ আলিহি ওআ স্বহবিহী ওআ মাও ওআলাহ ফী কুল্লি লামহাতিও ওআ নাফসিম মিন কুল্লি যাররাতিন 'আদাদা ইলমিকা।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ স্বালাত-সালাম বারকাত নাযিল করেন আপনার হাবীব আমাদের আব্দা মাওলা আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার উপর, যিনি আলোক সমুদ্রের আলো এবং রহস্যরাজির রহস্য আর তাঁর পরিবারবর্গের উপর আর স্বাহাবাগণের উপর এবং যারা তাঁকে ভালবাসেন তাদের উপরও।

তাওহীদের ফায়েয

তাওহীদ অর্থ একত্ব। 'আহাদের অধিকার নিরূপনই তাওহীদ। অপর কথায় যা কিছু আহাদ সম্পর্কিত তাই তাওহীদ। আহাদ মানে একক যাকে ভাগ করা যায় না, ইউনিট, মৌলিক, আদি, অবিভাজ্য, এক কথায় যার অধিকারে ভাগ বসানো যায় না বা কারো কোনো অধিকার যেখানে খাটেনা, কোন মুখাপেক্ষীতার

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

প্রশ্ন যেখানে উঠেনা, সে সত্ত্বাই আহাদ। এখন দেখা যাক আহাদ কিভাবে নিজের পরিচয় দিতে চাইছেন। তিনি পরিচয় জানাতে বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামাকে নির্দেশ দিলেন- "বলুন, তিনি আল্লাহ একক, কারো মুখাপেক্ষী নহেন, তার অস্তিত্বে জ্ঞান দেয়া নেয়ার প্রশ্ন নেই আর সমানে সমানে এ সত্ত্বার ভুলনা হতে পারে না।"

কুল হু আল্লাহ আহাদ। আল্লাহর স্বামাদ। লাম ইয়ালিদ অআ লাম ইউলাদ। অআ লাম ইয়াকুলাহ কুফুওআন আহাদ।

আল্লাহ কেন বুঝলেন এভাবে? 'আমি একক আদি' ইত্যাদি বললেন না কেন? আসলে ব্যাপারটা ভিন্নতর। কারণ আল্লাহ পর্যায়ে তাদের যে বিশ্বাস, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম যে আল্লাহর পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে কোন মিল নেই। এখানে হাকীকাত অনেক-

১। বন্ধুকে বলছেন বলে দিতে। তাতে একক সত্ত্বার অস্তিত্ব জোরালো ভাবে প্রকাশ পেলো।

২। প্রকাশকারী যে তার পরিচয় দেয়ার একমাত্র অথরিটি বা অধিকারপ্রাপ্ত একথার ঘোষণাও দেয়া হলো।

৩। "তিনি আল্লাহ" বলে, আল্লাহ নিজের নাম ঘোষণা করলেন। এবং এ নাম কারো দেয়া নাম নয়।

৪। তিনি সত্ত্বায় আদি, অদ্বিতীয়, নামেও আদি, অদ্বিতীয় ও একক।

৫। তিনি আদিতে যেমন আহাদ অস্তেও তেমনই আহাদ।

আচার আচরণ দোষ গুণ ভাব প্রকৃতি বা সৃষ্টির সাথে যা জড়িত তা কখনো আল্লাহর পরিচায়ক বা শানের লায়েক হতে পারেনা।

এবার দেখা যাক অধিকার বলতে কি বুঝায়-এর দুটো পর্যায়- প্রথমতঃ সত্ত্বা হিসাবে যেমন তিনি আদি, তিনিই মৌলিক, তিনিই একক, তিনিই নিত্য, তিনিই নিরাকার, তিনিই স্থিতিবান, নিজেই বিকশিত, সদা সচেতন, সদা বিরাজমান ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব আধিপত্য, দয়া-মায়্যা, শান্তি-ক্ষমা, আশ্রয়-সাহায্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, জীবন-মৃত্যু, দেয়া না দেয়া, সৃজন-প্রতিপালন, পরিচালন, গ্রহণ-বর্জন সব কিছুতেই তাঁর একক অধিকার। বস্তুতঃ তিনিই সব কিছুর মালিক। তাঁরই সৃষ্টি আমরা। (নাফী ও ইসবাত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

এ সবার অধিকারী না হলে সৃষ্টি হওয়া যায় না তাতে স্বাভাবিক। তবে কথা হলো আল্লাহ কেন মানবকে তাঁর খালীফাহ বা প্রতিনিধি বানিয়ে এজগতে পাঠালেন তা জানা দরকার এবং খালীফাহর দায়-দায়িত্ব ফরমাতা ও অধিকার কি, সে বিষয়ে অবশ্যই পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কথায় কথায় শিরুক হয়ে যায়, যাদের ধারণা, তাদের মতে তো আর বাঁচার উপায় নেই। তাছাড়া ওআসীলা ধরা শিরুক, কারো কাছে কিছু চাওয়া ইত্যাদিও তাদের মতে শিরুক। যা বাস্তব কথা নয়।

এদিকে আল্লাহ বলেন- “আল্লাহর রঙ্গ রঙ্গীন হতে। আল্লাহর রঙ্গের চেয়ে উত্তম রং হিসাবে কিইবা থাকতে পারে।” আর হাবীব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআালিহী ওআ সাল্লাম নির্দেশ দেন- “তাখাল্লুক বি আখলাকিল্লাহ” আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। কোন চরিত্রগুলো এ নির্দেশের আওতায় পড়ে তা অবশ্যই জানতে হবে। তাকে যে এ গুণাবলী অর্জন করে খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অপরদিকে আল্লাহ যেহেতু নিজ সৃষ্টির কাছে প্রকাশ্যে ধরা দিতে চান না। অথচ বান্দার মাঝে তার নিজের রং দেখতে চান। বান্দার প্রতিটি চিন্তায়, কাজে, আচার আচরণে, অন্তরে বাহিরে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত স্বভাবগুলো মূর্ত হয়ে সুন্দর হয়ে বসন্তের ফুলগুলোর মত ফুটে ফুটে তাঁকে বিকশিত করে, অপার আনন্দে ভরে দেবে, তাইতো তিনি চান। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর বন্ধুই তাঁর সুন্দর চরিত্রের বিকাশ, সৌন্দর্যের নমুনা। প্রিয় সৃষ্টি মানবকে সে নমুনায় নিজেকে সাজিয়ে স্রষ্টাকে আনন্দ দিতে হবে। সৃষ্টিকে করতে হবে সার্থক। এতে এক কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সত্তা বা যাত সম্পর্কিত চরিত্রে কারো কোন দখল নেই। কেহ অনধিকার চর্চা করলে শিরুক এর দায়ে দণ্ডিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সৃষ্টি সম্পর্কিত স্রষ্টার স্বভাব গুলো বা সিফাত সমূহ অর্জন করে নিজেকে নমুনা মারফক সে রং-এ সাজাতে না পারলে, হবে না তার কাছে গ্রহণ যোগ্য।

আল্লাহর নিজ যাত পাক বা পবিত্র সত্তার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন গুণ বা সিফাতের প্রয়োজন নেই। সিফাতের প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য। যেহেতু যাত হিসাবে তিনি সর্বসত্তার সর্বময় সর্বাধিকারী, তাই তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁকে মিটাতে হয়। সর্বোপরি প্রতিপালক ‘রাব’ তিনি। তাই রুব্বিয়াত প্রতিপালন বুঝার জন্য প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়েছেন বান্দাকে। রিয়ক আল্লাহর নিজের জন্য প্রয়োজন হয়না বা প্রয়োজ্য নহে। দয়া, ক্ষমা, সুখ, শান্তি কিছুই আল্লাহর প্রয়োজনে আসেনা। প্রয়োজন শুধু বান্দার। গুণ বান্দার মধ্যে না থাকলে আল্লাহর কাছে চাইলে পাওয়া না পাওয়া অনুভব করবে কি করে, যে বিষয়ের সাথে পরিচয় নাই তা চিনবে কি করে।

সমস্ত সৃষ্টিতো স্রষ্টার বিধান নিয়মিত মেনে চলেছে। কোনই ব্যতিক্রম নেই

তাতে। কিন্তু মানুষ নামের এই খালীফাহ সাহেবানরা যে তাঁর কথা মানছেন না, তারা যে উল্টো করেই তৃপ্তি পান।

আসলে আল্লাহকে মানামানির প্রশ্নে অনেক মতের দৃশ্য জমে উঠেছে। কথায় বলে নানা মনির নানা মত। অনেকে বলেন শক্তি, মহাশক্তি, প্রকৃতি, যেভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, আমার আল্লাহকেই তো মানছে, অজান্তে তাঁর কাছে সাপে দিচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা এতো খেয়ালী মনে করলে চলবে কি করে। কারণ যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলি, সে যুগের পণ্ডিতরা বহু শক্তির যেমন পূজা করতো তেমনই মহা শক্তির পূজাও করতো। মানতনা শুধু নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামার আল্লাহকে। কই আল্লাহতো তাদের গ্রহণ করেননি! কারণ, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তাদের কালেমা ছিল, ছিলনা শুধু “মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামা, তাই তারা আল্লাহদ্রোহী কান্ধির ছিল। এ উম্মাতের জন্য একমাত্র খবর দাতা রাসুল মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামাকে অবিশ্বাস করলে ঈমানদার হতে পারেনা। তাই আমাদের জন্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম তাওহীদের মূল মন্ত্র।

তাওহীদের শক্তিতে শক্তিশালী করতে হবে আমার মাঝে বিরাজমান প্রতিটি অণু পরমাণুর সত্তাকে। তাহলেই আমি দুর্বলতা কাটিয়ে সবল হব। ঈমানের সালামতির জন্য এ যুগে তাওহীদের যিকির বিশেষ রক্ষা কবজ। দাজ্জালের চেলাদের সাথে এবং অবশেষে দাজ্জালের সাথে ঈমানের লড়াইয়ে জয়ী হতে হবে ইনশাআল্লাহ। তাই সব সময় যিকুর জারী রাখতে হবে, প্রতিবারে বিসমিল্লাহ যোগ করে যিকুর করলে প্রতিবারেই স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লাম মিলিয়ে নিতে হবে।

সমস্ত শরীরের অণু পরমাণুর দিকে খেয়াল করে নিয়াত করে আরজু করতে হবে- তাওহীদের যিকিরের ফায়েযে আমার প্রতিটি অণু পরমাণুর জড়তা দূর হয়ে যাক, শয়তানের ঘাটি ধ্বংস হয়ে যাক। যিকুর জারী হয়ে যাক। তাওহীদের নূরে নূরানী হয়ে যাক। তাওহীদের শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে যাক। সকল অণু পরমাণুর প্রত্যেকটিই এক একটা মুজাহিদ হয়ে যাক।

নিয়াত : আমি আমার জিসম ও জানের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ আছি। আমার জিসম ও জান পীর কেবলার জিসম ও জানের ওআসীলায় আল্লাহ তাআলার যাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ আছি। যাত পাক হইতে আমার জিসম ও জানে হাক্কীক্বাতে তাওহীদের ফায়েয আসুক। আমার জিসম ও জানের প্রতিটি অণু পরমাণু যিকুর করুক ‘বিসমিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ’ ‘আলাইহি স্বল্লতুল্লাহ।

বিশেষ দরুদ শরীফ

আস্ব স্বলাতু ওআস সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলান্নাহ ওআ আলিকা ওআ স্বহবিকা ওআ মাওঁ ওআলাকা ইয়া হাবীবান্নাহ, ক্বাদ দ্বোআক্বাত হীলাতী, আদ্রিকনী।

আল্লাহুমা ইন্না নাস'আলুকা ওআ নাতাওআজ্জাহ ইলাইকা বিজাহি হাবীবিকা সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সালাম। আস্ব স্বলাতু ওআস সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলান্নাহ, ওআ আলিকা ওআ স্বহবিকা ওআ মাওঁ ওআলাকা ইয়া হাবীবান্নাহ, ইন্না নাতাওআজ্জাহকা ইলা রব্বিনা লিতুক্বদ্বা লানা হাজাতিনা ফাশফা' লানা 'ইন্দাল মাওলাল 'আযীম, ইয়া নি'মার রাসূলুত্ব ত্বাহির। আল্লাহুমা শাফ্ফি'হু ফীনা বিজাহিহী ইন্দাকা।

আল্লাহুমা স্বল্লি ওআ সাল্লিম ওআ বারিক 'আলা হাবীবিকা সায্যিদিনা আহমাদ, নাবিয়্যির রাহ্মাতি ওআল বারাকাতি, ওআল মুহাব্বাতি, ওআল মাগফিরাতি, ওআল কুওআতি ওআল কুদ্রাতি ওআ আলিহী ওআ স্বহবিহী ওআ মাওঁ ওআলাহু ফী কুল্লি লামহাতিওঁ ওআ নাফাসিম মিন কুল্লি যাররতিন 'আদাদা 'ইলমিকা।

আল্লাহুমা স্বল্লি 'আলা সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওআ 'আলা আলি সায্যিদিনা মুহাম্মাদিন স্বলাতান দায়িমাতাম মাক্বূলাতান তু'আদী বিহা 'আন্না হাক্কাহুল 'আযীম। (জাযূলীয়া ত্বরীক্বা)।

একটা প্রক্রিয়া বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহুমা শব্দ থেকে শুরু করে সায্যিদিনা আহমাদ বা মুহাম্মাদ শব্দ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় ঠিক থাকবে। এরপর নূরিল আনওআরি বা এরূপ গুণ বাচক শব্দগুলো বদলিয়ে যখন যে কথা বলা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করতে হবে, আর পরবর্তীটা অর্থাৎ ওআ আলিহী থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকবে।

বিশেষ করে কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় এবং কোন কিছু পাওয়ার আশায় 'নাবিয়্যিল ক্বাসিমি- বন্টনকারী নাবী, এবং ওআদ্ব গোসলের সময় 'নাবিয়্যিত ত্বাহিরী ওআল মুতাহিরি-পবিত্র নাবী-পবিত্রকারী নাবী উল্লেখ করতে হবে।

যেমন : আল্লাহুমা স্বল্লি ওআ সাল্লিম ওআ বারিক 'আলা হাবীবিকা সায্যিদিনা আহমাদ, ওআ আলিহী ওআ স্বহবিহী ওআ মাওঁ ওআলাহু ফী কুল্লি লামহাতিওঁ ওআ নাফাসিম মিন কুল্লি যাররতিন 'আদাদা 'ইলমিকা।